
প্রকৃতি
বিজ্ঞান
পঞ্চম শ্রেণী

প্রকৃতি-বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণী

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশকঃ
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স্ বিল্ডিংস্
কলিকাতা-১

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৬
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, ১৯৬৯

মূল্য ৪০ পয়সা মাত্র

মুদ্রক ঃ
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

নিবেদন

অল্পমূল্যে সহজবোধ্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসারে "প্রকৃতি-বিজ্ঞান" প্রকাশিত হল।

এই বইয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তথ্য কিশোর মনের উপযোগী করে ধারাবন্ধভাবে ও সহজ ভাষায় পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভুলত্রুটির সংশোধন অথবা বইটির উন্নতিকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে।

যাঁরা এই পুস্তক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণের যাবতীয় কাগজ সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নিকট থেকে পাওয়া গেছে। সে কারণেই পুস্তকের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ করা সম্ভব হল। সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের শিক্ষানুরাগের পরিচায়ক এ দান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌,
কলিকাতা,
১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শিক্ষা-অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ।

সূচীপত্র

বইয়ের শেষে অনুশীলনী দেওয়া হল

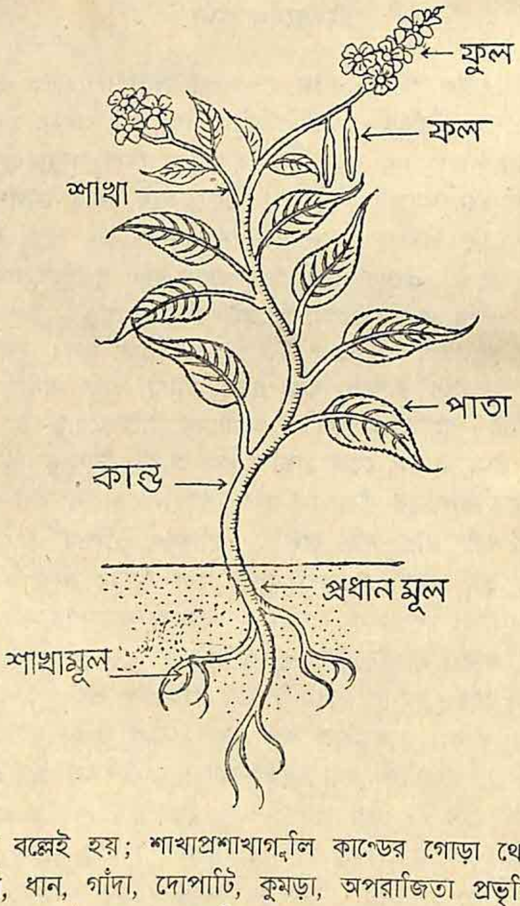
প্রকৃতি-বিজ্ঞান

উদ্ভিদের কথা

আমাদের দেশে অনেক রকম গাছপালা আছে। এদের কতকগুলি আমাদের বিশেষ পরিচিত। আম, জাম, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ আকারে বেশ বড়। এই সকল গাছের গুঁড়ি বেশ লম্বা এবং মাটির উপর সোজা হয়ে থাকে। গুঁড়ির উপরের অংশ থেকে ডালপালা বের হয়। ডালপালায় অসংখ্য সবুজপাতা সাজান থাকে। জবা, হাস্নাহানা প্রভৃতি গাছ ছোট। এদের গুঁড়ি প্রায় থাকে না। সবুজপাতাসহ ডাল-পালাগুলি মাটির একটু উপর থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। আবার কুমড়া, অপরাজিতা, আমরুল প্রভৃতি মাটির উপর লতিয়ে যায়। সকল প্রকার গাছকে সাধারণভাবে উদ্ভিদ্ বলা হয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা উদ্ভিদের নিকট বহুরকমে ঋণী। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ডাল, মসলা, তেল প্রভৃতি দ্রব্য আমরা উদ্ভিদ্ থেকে পাই। পরিধেয় সুতীকাপড়ের উপাদান তুলা, গৃহনির্মাণ ও আসবাব তৈরি করার জন্য কাঠ, বাঁশ, দড়ি প্রভৃতি জিনিসও উদ্ভিদ্ থেকে উৎপন্ন হয়। নানাপ্রকার গাছের সুমিষ্ট রসাল ফল আহার করে আমরা তৃপ্ত হই। কতকগুলি গাছের ফুল বর্ণে ও সুগন্ধে আমাদের অপার আনন্দ দান করে। কালমেঘ, বাসক, চিরতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়। এছাড়া আরও অনেক রকমে উদ্ভিদ্ আমাদের অশেষ উপকার করে।

বৃক্ষ ঃ আমরা সাধারণত বড় বড় গাছকে বৃক্ষ বলি। এগুলি মাটি থেকে তুলে পরীক্ষা করা সহজ নয়। একটি ছোট গাছ মাটি থেকে ওঠালে দেখা যায় যে এর প্রধান অংশ তিনটি। একটি অংশ মাটির তলায় থাকে—এটাকে শিকড় বা মূল বলে। মাটির উপরের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখাগুলি গাছের দ্বিতীয় অংশ। বড় গাছগুলির কাণ্ড বেশ শক্ত, মোটা ও লম্বা। এই অংশ মাটির উপর সাধারণত

সরলভাবে দাঁড়িয়ে গুঁড়ির আকার ধারণ করে। এইসব গাছে উপরের দিকে কাণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শাখাপ্রশাখা বের হয়। জবা প্রভৃতি গাছের কাণ্ডও শক্ত এবং বড় বড় গাছের কাণ্ডের মতন নিরেট এবং কাষ্ঠময় তবে এগুলির কাণ্ড লম্বা হয় না অর্থাৎ এদের

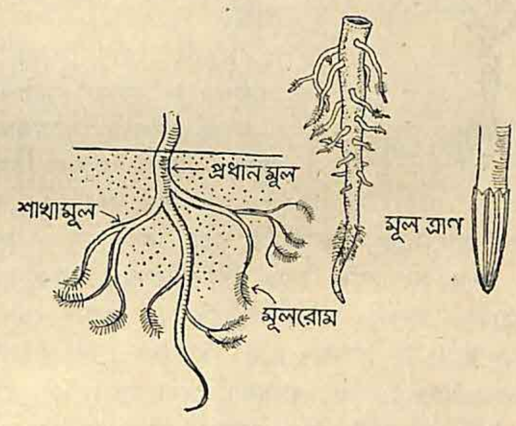


গুঁড়ি নেই বল্লেই হয়; শাখাপ্রশাখাগুলি কাণ্ডের গোড়া থেকেই বের হয়। দূর্বা, ধান, গাঁদা, দোপাটি, কুমড়া, অপরাজিতা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড নরম। দূর্বা, কুমড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ড দুর্বল এবং মাটিতে

লুটিয়ে পড়ে। এই দুর্বল কাণ্ড থেকেই শাখাপ্রশাখা বের হয়ে মাটিতে লতিয়ে বেড়ায়। কুমড়া, অপরাজিতা প্রভৃতির কাণ্ড কোন অবলম্বন পেলে তা জড়িয়ে উপরে উঠতে পারে। গাছের তৃতীয় অংশ পাতা। সাধারণত এগুলি সবুজ হয় এবং শাখাপ্রশাখায় সাজান থাকে। মূল, কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা, এবং পাতা ছাড়াও অনেক গাছে ফুল ও ফল হয়। চারাগাছ যখন বেশ বড় হয় তখন গাছে ফুল ফোটে। এই ফুল থেকে ফল হয়, ফলের মধ্যে থাকে বীজ। পুষ্ট ফল পাকলে বা ফেটে গেলে বীজ মাটিতে পড়ে। তখন উপযুক্ত পরিমাণ জল, হাওয়া, রৌদ্র, তাপ পেয়ে এই বীজ থেকে নূতন চারাগাছ জন্মায় এবং ক্রমে সেই চারাগাছ বড় হয়। পরিণত বয়সে এই গাছে আবার ফুল ও ফল ধরে।

বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের কার্য

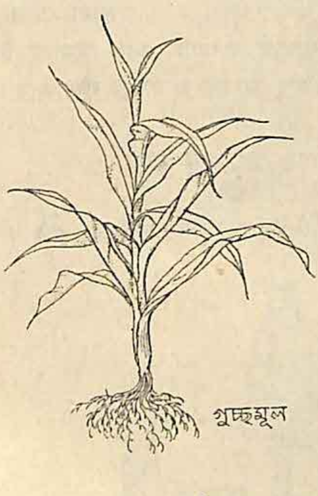
বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় তখন একটি অংশ মাটির উপরে ওঠে ও



বৃক্ষের মূল

আর একটি অংশ মাটির নিচে যায়। মাটির নিচের অংশই পরে প্রধান মূল হয়।

একটি আম, ছোলা বা সরিষা গাছের চারা মাটি থেকে ওঠালে দেখা যায় যে প্রধান মূলের গা থেকে অনেকগুলি শাখামূল বেরিয়ে আছে। আম, ছোলা প্রভৃতি গাছে প্রধান মূল স্থায়ী হয়। কিন্তু ভুট্টা, ধান, ঘাস, পেঁয়াজ প্রভৃতি গাছে প্রধান মূল শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে কাণ্ডের গোড়া থেকে এক গুচ্ছ সরু সরু শিকড় বা মূল বেরোয়। একে গুচ্ছমূল বলে।

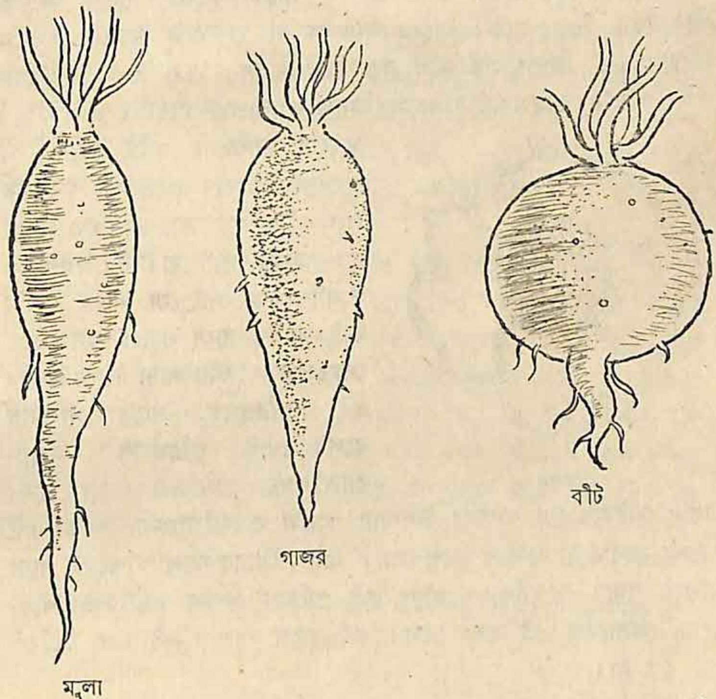

গুচ্ছমূল

মূলের কার্য ঃ প্রধান মূল ও তার শাখাপ্রশাখাগুলি অথবা গুচ্ছ-মূল গাছকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে ধরে রাখে। সেজন্য ঝড় বাতাসে গাছ সহজে পড়ে যায় না। চারাগাছকেও মাটি থেকে ওঠাতে বেশ জোর লাগে। গাছকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে ধরে রাখা মূলের একটি প্রধান কাজ।

মূলের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ মাটি থেকে খাদ্যবস্তু জলে দ্রব অবস্থায় শোষণ করা। এই রস কাণ্ডের ভিতর দিয়ে পাতায় গিয়ে পৌঁছায়। মূল বা তার শাখাপ্রশাখাগুলিকে শক্ত মাটি ভেদ করে যেতে হয়। এই সময় এদের নরম আগাগুলি যাতে মাটির সংঘাত থেকে রক্ষা পায় সেজন্য প্রত্যেকটি মূলের আগায় টুপির মত একটি ছোট ঢাকনা থাকে—এটিকে মূলত্র বা মূলত্রাণ বলে। মূলত্রের কিছু উপরে মূলের খানিকটা অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম মূলরোম দেখা যায়। এই মূলরোমের সাহায্যেই গাছের মূল মাটি থেকে খাদ্যবস্তু জলে দ্রব অবস্থায় শোষণ করে।

মূলা, গাজর, শালগম প্রভৃতি গাছ মূলের মধ্যে খাদ্য জমা করে রাখে। সেই কারণে এইসব গাছের মূল বেশ মোটা হয়।

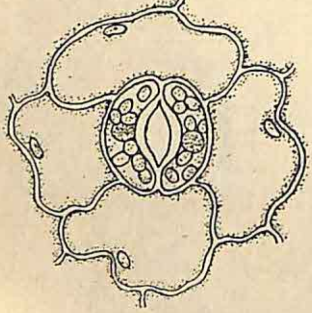
কাণ্ডের কার্য ঃ কাণ্ড সাধারণত মাটির উপরে থাকে। কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখাগুলির প্রধান কাজ সবুজপাতাগুলিকে সূর্যকিরণে ধরে রাখা। মাটি থেকে গাছ যে রস শোষণ করে তা কাণ্ডের ভিতর দিয়ে পাতায় পেঁছায়। সেখানে এই রস উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাজে লাগে। তৈরী হওয়ার পর ঐ খাদ্য আবার কাণ্ডের ভিতর দিয়ে গাছের বিভিন্ন



বর্ধনশীল অংশে পেঁছায় এবং গাছের পুষ্টিসাধন করে। কতকগুলি গাছে কাণ্ড বা তার কিছুটা অংশ মাটির নিচে থাকে। আদা, আলু, ওল প্রভৃতি গাছের এইরকম ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড দেখা যায়। এইসব কাণ্ডের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে।

পাতার কার্য ঃ গাছের কান্ড ও তার শাখাপ্রশাখায় অসংখ্য সবুজ পাতা থাকে। পাতায় প্রচুর সবুজকণা (ক্লোরোফিল) থাকে তাই পাতা সবুজ দেখায়। পাতার প্রধান কাজ তিনটি ঃ (ক) খাদ্য তৈরি করা, (খ) শ্বাসকার্য চালান, এবং (গ) দেহের ভিতরকার অতিরিক্ত জল বাষ্পের আকারে বের করে দেওয়া।

(ক) পাতার একটা পিঠ সূর্যের দিকে থাকে। পাতায় অনেক ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এদের রন্ধ্রপথ বা 'স্টোমাটা' বলে। সূর্যের আলোয় এই ছিদ্রগুলির মুখ বড় হয়ে খুলে যায়। তখন বাতাসের সংগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছিদ্রপথে পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। মূলের সাহায্যে মাটি থেকে যে খাদ্যের উপকরণ জলে দ্রব অবস্থায় সংগৃহীত হয় কান্ডের মধ্য দিয়ে তা পাতায় পেঁাছায়। সবুজকণা ও সূর্যকিরণের সাহায্যে পাতা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও এই রস থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াকে সালোক-সংশ্লেষ বলে। এই প্রক্রিয়াকে অংগার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়াও বলা হয়।



রন্ধ্রপথ

কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উপাদান কার্বন ও অক্সিজেন। পাতা এই গ্যাসের কার্বন বা অংগার অংশ নেয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে যায়। সূর্যকিরণ ছাড়া এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয় তাই শুধু দিনের বেলাতেই এই কাজ চলে। রাত্রিকালে পাতায় এই খাদ্য তৈরির কাজ হয় না।

(খ) গাছেরও আমাদের মত দিনরাত শ্বাসকার্য চলে। শ্বাসক্রিয়ার সময় গাছ আমাদের মতন অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। স্টোমাটার পথে বায়ু পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। গাছ বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে। গাছের দেহের ভিতর জীবকোষে শ্বাসপ্রক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও সামান্য

জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস স্টোমাটার পথে বেরিয়ে যায়। শ্বাসকার্য দিনরাত সকল সময়েই সমানভাবে চলে। দিনের বেলায় সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ও শ্বাসকার্য একই সঙ্গে চলে তবে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্রুত চলে সেজন্য শ্বাসকার্য যেন ঢাকা পড়ে যায়। রাত্রিকালে যখন সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন শ্বাসক্রিয়া পরিষ্কার বোঝা যায়।

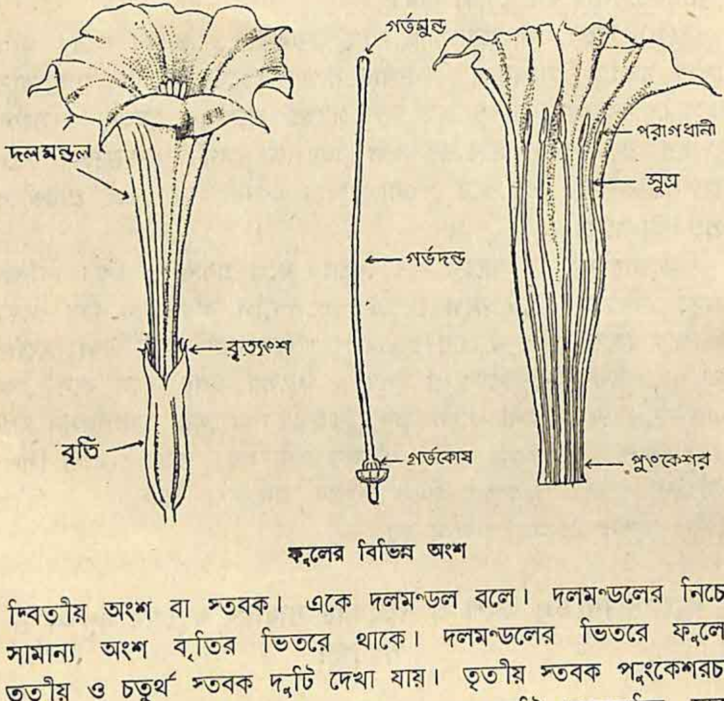
(গ) মূলের সাহায্যে গাছ শুধু তরল বস্তু শোষণ করে। মাটি থেকে খাদ্যের উপাদান দ্রব অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয় বলে গাছ প্রচুর জল শোষণ করে, কিন্তু এত জল গাছের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ছিদ্রপথে অর্থাৎ স্টোমাটার পথে বাষ্পের আকারে বের করে দেওয়া পাতার একটি কাজ। এই প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বলে।

ফুলের কার্য ঃ গাছের বংশবিস্তারে ফুল প্রধান সহায়ক। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গাছে ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাধারণত নানা রঙের ও সুগন্ধযুক্ত হয়। ফুলের রঙ এবং গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এবং ফুলের মধুর লোভে নানারকমের কীটপতঙ্গ ফুলের উপর এসে বসে এবং এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যায়। এইভাবে ফুলের পরাগমিলন ঘটে এবং ক্রমশ ফুল থেকে ফল ও বীজের জন্ম হয়। বীজের মধ্যে শিশু উদ্ভিদ্ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। পরে অনুকূল অবস্থায় ঐ বীজ থেকে নূতন চারাগাছের জন্ম হয়।

ফুলের বিভিন্ন অংশ ও কয়েকটি সাধারণ ফুলের বর্ণনা ও পরীক্ষা

সাধারণত একটি ফুলে চারটি অংশ বা স্তবক থাকে, যথাঃ (১) বৃতি calyx (২) দলমণ্ডল corolla (৩) পুংকেশরচক্র, ও (৪) গর্ভকেশরচক্র। একটি ধুতুরাফুল পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ফুলটি একটি বোঁটার উপর অবস্থিত। ফুলের অংশ চারিটি বোঁটার উপর পরপর সাজান থাকে। সকলের নিচে বোঁটার দিকে যে

সবুজ রঙের অংশ থাকে তাকে বৃতি বলে। বৃতির উপরভাগ দাঁতের মত পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। দাঁতের মত প্রত্যেকটি অংশকে বৃত্যংশ বলে। নিচের দিকে জোড়া অবস্থায় এগুলি একটি নলের আকার ধারণ করে। বৃতির একটু উপরে পাঁচটি সাদা বা ঈষৎ বেগুনী রঙের দল বা পাপড়ি একসঙ্গে জুড়ে একটি কলকের আকার ধারণ করে। এটাই ধুতুরাফুলের



ফুলের বিভিন্ন অংশ

দ্বিতীয় অংশ বা স্তবক। একে দলমণ্ডল বলে। দলমণ্ডলের নিচের সামান্য অংশ বৃতির ভিতরে থাকে। দলমণ্ডলের ভিতরে ফুলের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক দুটি দেখা যায়। তৃতীয় স্তবক পুংকেশরচক্র এবং চতুর্থ স্তবকটি গর্ভকেশরচক্র। দলমণ্ডলটি লম্বালম্বি কেটে ভিতরের অংশ পরীক্ষা করলে দলগুলির গায়ে পাঁচটি পুংকেশর দেখতে পাওয়া যায়। পুংকেশরগুলি আকারে লম্বা ও সরু এবং পুংকেশর নিচের দিকে দলমণ্ডলের সঙ্গে জোড়া। পুংকেশরের লম্বা সরু অংশটিকে সূত্র বলে। সূত্রের মাথায় একটি চেপ্টা থলি থাকে—

একে পরাগকোষ বা পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট হলদে পরাগ বা রেণু থাকে। ফুলের চতুর্থ স্তবক গর্ভকেশরচক্র ফুলের ভিতরে ঠিক মাঝখানে থাকে। গর্ভকেশরের নিচের বা গোড়ার অংশ সামান্য মোটা ও ফাঁপা। এই অংশটিকে গর্ভকোষ বা ডিম্বাশয় বলে। গর্ভকোষের উপরের অংশ সরু ও লম্বা নলের মতন। এই অংশকে গর্ভদণ্ড বলে। গর্ভদণ্ডের আগা সামান্য চেপ্টা এবং দুইভাগে বিভক্ত—এর প্রত্যেক অংশকে গর্ভমুণ্ড বলে। অনেক সময় ফুলের গর্ভমুণ্ডের সংখ্যা দ্বারা গর্ভকেশরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। ধুতুরাফুলে গর্ভকেশরের সংখ্যা দুইটি, এরা একসঙ্গে জুড়ে গর্ভকেশর-চক্র সৃষ্টি করেছে। গর্ভকোষের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ডিম্ব থাকে—এগুলিই ভাবী বীজ।

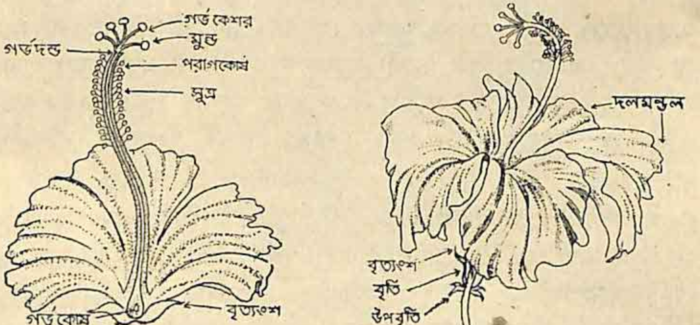
ফুলের বোঁটার যে অংশটিতে চারটি স্তবক পর পর এইভাবে সাজান থাকে তাকে পুষ্পাধার বলে।

যে ফুলে চারটি স্তবকই বর্তমান তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। ধুতুরাফুলে চারটি স্তবক আছে, সুতরাং এটি একটি সম্পূর্ণ ফুল। যে ফুলে চারটি স্তবক থাকে না তাকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। জবা, অপরাজিতা, বক প্রভৃতি ফুলগুলি সম্পূর্ণ ফুল। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফুল অসম্পূর্ণ ফুল। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফুলের কোনটিতে পুংকেশরচক্র থাকে না আবার কোনটিতে গর্ভকেশরচক্র থাকে না। যে ফুলটিতে পুংকেশরচক্র নেই কিন্তু গর্ভকেশরচক্র আছে সে ফুলটি স্ত্রীফুল আর যেটিতে গর্ভকেশরচক্র নেই কিন্তু পুংকেশরচক্র আছে সেটি পুরুষফুল। লাউ বা কুমড়ার পুরুষফুল ও স্ত্রীফুল একই গাছে ফোটে কিন্তু পেঁপে, তাল প্রভৃতি গাছের কোনটিতে শুধু পুরুষফুল এবং কোনটিতে শুধু স্ত্রীফুল হয়।

ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন বৃতি ফুলের অন্যান্য অংশকে ঢেকে রাখে এবং বাতাস, রৌদ্র, তাপ, জলবৃষ্টি, শিশির, পোকা প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে। দল বা পাপড়িগুলি অনেক সময় নানা রঙের হয়। পাপড়ির রঙ অনুসারেই ফুলটি কোন্ রঙের বলা হয়। যে সকল ফুল দিনে ফোটে তারা নানা বর্ণের হয়। যে সকল ফুল রাত্রিকালে

ফোটে সেগুলি প্রায়ই সাদা হয় তবে তাদের অধিকাংশের থাকে সুগন্ধ। দলগুলির উজ্জ্বল রঙ ও সুগন্ধ অথবা ফুলের মধু কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে প্রলুব্ধ করে। পতঙ্গেরা ফুলে এসে বসে এবং এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে বেড়ায়। ফলে পুংকেশরের রেণু সেই জাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মিলন ঘটে। দলমণ্ডলের প্রধান কার্য কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে এইরূপ মিলন ঘটান। পুংকেশর ও গর্ভকেশরচক্র—এই দুইটি ফুলের প্রধান অংশ। এদের সাহায্যেই গাছের বংশবিস্তার সম্ভব। মিলন ঘটার পর ফুল থেকে ফল হয়। ফলের মধ্যে যে বীজ থাকে তা থেকেই ভবিষ্যতে নূতন চারাগাছের জন্ম হয়।

জবাফুল ঃ এই ফুলের বোঁটা আছে সেজন্য একে সবৃন্তক ফুল বলে। জবাফুলে চারটি স্তবকই বর্তমান তাই জবাফুল একটি সম্পূর্ণ ফুল।



জবাফুল

বৃতি ঃ এর সবুজ রঙের বৃতিতে পাঁচটি বৃত্যংশ। এগুলি পরস্পর জোড়া অবস্থায় একটি চোঙের মতন। বৃতির নিচে বোঁটার মাথায় পাঁচটি সরু সরু সবুজ অংশ দেখা যায়—এই অংশকে উপবৃতি বলে।

দলমণ্ডল ঃ বৃতির মধ্যে থাকে দলমণ্ডল। লাল জবার দলমণ্ডলে পাঁচটি লাল রঙের পাপড়ি থাকে। পাপড়িগুলি উপরের দিকে পৃথক্ কিন্তু নিচের দিকে পরস্পর কতকটা জোড়া।

পুংকেশরচক্র ঃ পুংকেশরচক্রে অনেকগুলি পুংকেশর থাকে। এইসকল পুংকেশরের সূত্রগুলি একসঙ্গে জোড়া লেগে একটি সরু নলের আকার ধারণ করে। এই নলের আগার দিকে সরু সরু সূত্রের সামান্য একটু অংশ নল থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং এদের প্রত্যেকটির মাথায় একটি করে ছোট পরাগধানী থাকে। এই নলটির নিচের অংশ পাপড়ির নিচের অংশের সঙ্গে জোড়া।

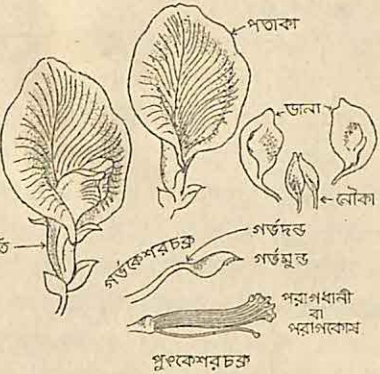
গর্ভকেশরচক্র ঃ পুংকেশরের সূত্রগুলি জোড়া লেগে যে নল সৃষ্টি করে সেটা লম্বালম্বি চিরে ফেললে গর্ভকেশরচক্র বেরিয়ে পড়ে। গর্ভকেশরের তিনটি অংশ ঃ গর্ভকোষ, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড। গর্ভকোষ অংশ মোটা এবং এর ভিতরে অসংখ্য ডিম্বক থাকে। গর্ভদণ্ডটি সরু, লম্বা এবং আগার দিকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের আগায় একটি করে গর্ভমুণ্ড অবস্থিত। পাঁচটি গর্ভমুণ্ড থেকে বোঝা যায় যে গর্ভকেশরের সংখ্যা পাঁচ। এগুলি পরস্পর জুড়ে গিয়ে গর্ভকেশরচক্র সৃষ্টি করেছে।

অপরাজিতা ফুল ঃ অপরাজিতা ফুল সাদা, নীল অথবা ঈষৎ বেগুনী রঙের হয়। অপরাজিতা সবৃন্তক এবং সম্পূর্ণ ফুল। ফুলের বোঁটাটি ছোট।

বৃতি ঃ এই ফুলের বৃতি সবুজ এবং পাঁচটি বৃত্যংশ নিয়ে গঠিত। বৃত্যংশগুলি পরস্পর জোড়া।

দলমণ্ডল ঃ এটি বৃতির মধ্যে অবস্থিত। দলমণ্ডলে পাপড়ি বা দলের সংখ্যা পাঁচ। পাপড়িগুলি পরস্পর আলাদা। এগুলি সাদা, নীল অথবা ঈষৎ বেগুনী রঙের হয়। পাপড়িগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যে ফুলটিকে একটি প্রজাপতির মতন দেখায়। পাপড়িগুলির আকার সমান নয়। একটি পাপড়ি অন্যগুলির চেয়ে অনেক বড়। ফুলের কুঁড়ি অবস্থায় এই পাপড়িটি অন্য পাপড়িগুলিকে ঢেকে রাখে। ফুল ফুটলে এই পাপড়িটি অন্য দলগুলি থেকে সরে আসে এবং উঁচু

হয়ে থাকে। এই বড় পাপড়িটিকে বলে পতাকা। পতাকার ভিতরে দুই পাশের সমান পাপড়ি দুটিকে বলে ডানা। ডানা জোড়ার ভিতরে আরও একজোড়া সমান পাপড়ি থাকে। এদুটি পরস্পর জোড়া অবস্থায় নৌকার খোলের আকার ধারণ করে। এই দুটিকে বলে নৌকা।



অপরাজিতা

পুংকেশরচক্র ঃ পুং-কেশরচক্রে দশটি পুংকেশর থাকে। এর নয়টি একসঙ্গে জোড়া এবং অপর পুং-কেশরটি আলাদা। প্রত্যেক পুংকেশরের সূত্রের মাথায় একটি ছোট পরাগধানী বর্তমান।

গর্ভকেশরচক্র ঃ গর্ভকেশর মাত্র একটি। জোড়া লাগা পুংকেশর-গুলি গর্ভকেশরটিকে আংশিকভাবে ঢেকে রাখে। গর্ভকেশরের গর্ভকোষটি লম্বা এবং সামান্য চেপ্টা। এর ভিতরে কয়েকটি ডিম্বক সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে। গর্ভদণ্ডটি সরু এবং এর আগায় একটি গর্ভমুণ্ড অবস্থিত। গর্ভমুণ্ডে আঠার মতন একপ্রকার পদার্থ থাকে, হাত দিলে চট্‌চটে মনে হয়।

ফুল সংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহপুস্তক

বৎসরের একই সময় সকল রকম গাছে ফুল ফোটে না। শীতের সময় যে ফুল পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে সে ফুল আর পাওয়া যায় না। জুঁই, বেল প্রভৃতি ফুল গ্রীষ্মকালে ফোটে। বসন্তকালে পলাশ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি ফুল হয়। বর্ষায় বকুল, কদম্ব প্রভৃতি ফুল পাওয়া যায়। শরৎকালের ফুল শেফালি সকলের পরিচিত। শীতের সময় পাওয়া যায় গোলাপ, গাঁদা, অপরাজিতা ও নানারকম বিলাতী ফুল।

সারা বৎসর যদি ফুল সংগ্রহ করে রাখা যায় তাহলে বৎসরের যে কোন সময় বিভিন্ন মরশুমের ফুল পরীক্ষা করা যায়। এই জন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ফুল সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন।

ফুল সংগ্রহের সময় ফুলের সঙ্গে গাছের পাতা ও সম্ভব হলে ফলসহ একটি ছোট ডাল সংগ্রহ করা উচিত। গাছ যদি ছোট হয় তবে ফুলসহ সমগ্র গাছটি সংগ্রহ করে রাখাই সুবিধাজনক। এগুলি যাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, কিছুদিন স্থায়ী হয়, সেজন্য সংগৃহীত ফুল ও অন্যান্য অংশ প্রথমে ব্লটিংকাগজের মধ্যে ভালভাবে রেখে কাগজের উপর কোন ভারী জিনিস চাপা দিতে হয়। ব্লটিংকাগজ ফুল ও অন্যান্য অংশ থেকে জল শুষে নেয়। কয়েকদিন রৌদ্রে রেখে অথবা কয়েকবার কাগজ বদল করে দিলেও পাতা, ফুল প্রভৃতি বেশ শুকিয়ে যাবে। তখন এই শুষ্ক ফুলপাতাসহ ডালটি একটি মোটা কাগজের খাতার পাতায় স্থানান্তরিত করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে অথবা সুতা দিয়ে কাগজের সঙ্গে সেলাই করে রাখতে হবে। সামান্য তুঁতের গুঁড়া মিশিয়ে আঠা তৈরি করলে ফুল বা কাগজ পোকায় কেটে নষ্ট করবে না। ন্যাপথলিনের গুঁড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে। খাতার একটি পাতায় একটিমাত্র নমুনা রাখা উচিত এবং ঐ পাতায় ফুলের নাম, সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সময় এবং বৈশিষ্ট্যসহ ফুলটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে রাখা প্রয়োজন। এইরূপে ফুল সংগ্রহ করে সংগ্রহপুস্তকে রক্ষা করলে এক বৎসরের মধ্যেই বিবরণ ও বৈশিষ্ট্যসহ অনেক রকম ফুলের নমুনা জমা হবে। ভবিষ্যতে যদি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তখন সংগৃহীত শুষ্ক ফুল নিয়ে কিছু সময় গরমজলে রেখে দিতে হবে। এতে ফুলটি নরম হবে এবং তখন পরীক্ষা করা সহজ হবে। সংগ্রহ-পুস্তক থেকে দরকারমত ফুলগুলির বিষয় জানা সহজ হবে।

পরাগমিলন

সাধারণত বীজ থেকেই গাছের বংশবিস্তার হয়। ফুল ফোটার পর ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগ বা রেণু কোনপ্রকারে গর্ভকেশরের

গর্ভমুণ্ডে এসে পড়ে। কোন ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগ যখন সেই ফুলের অথবা সেইজাতীয় অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে পরাগমিলন বলে। পরাগমিলনের ফলে ডিম্বক ও ডিম্বাশয়ের নানারকম পরিবর্তন হয় এবং পরে ডিম্বাশয় ও ডিম্বক যথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়। পরাগমিলনের পর ফুলটি শুকিয়ে যায় এবং বৃতি, দলমণ্ডল প্রভৃতি অংশ ঝরে পড়ে। ফুলের উজ্জ্বল রঙ ও সুমিষ্ট গন্ধের আকর্ষণে অথবা ফুলের মধুর লোভে মৌমাছি বা অন্যান্য পতঙ্গ ফুলের উপর এসে বসে। তখন এদের দেহে, ডানায় বা পায়ে পরাগ লেগে যায়। এই অবস্থায় মৌমাছি বা অন্য পতঙ্গ যখন এক ফুল থেকে উড়ে অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন এই পরাগ ঐ ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেগে যায়। এইরূপে পরাগমিলন ঘটে। একজাতীয় ফুলের পরাগ অন্যজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পড়লে কোন সুফল লাভ হয় না। যদি কেবল সেইজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পড়ে তবেই পরাগমিলন হয় এবং ফল ও বীজের সৃষ্টি হয়।

পরাগমিলন অনেক ফুলে কীটপতঙ্গের সাহায্যে ঘটে। কীট-পতঙ্গের সাহায্য ছাড়া অন্যরকমেও পরাগমিলন হতে পারে। ধান, যব, তাল প্রভৃতি কতকগুলি গাছের ফুলে পরাগমিলন হয় বাতাসের সাহায্যে। পাটাশেওলা প্রভৃতি কতকগুলিতে জলের সাহায্যে হয়। আবার মাদার, শিমুল প্রভৃতি কতকগুলি গাছে এই পরাগমিলন অন্যান্য প্রাণীর সাহায্যে হয়ে থাকে।

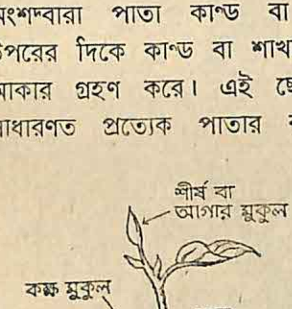
বৃক্ষ ও বৃক্ষের শাখাবিন্যাস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

আম, জাম, কাঁঠাল, বট, দেবদারু প্রভৃতি গাছের কাণ্ড বেশ মোটা, শক্ত, নিরেট এবং কাষ্ঠময় হয়। এই সব গাছের কাণ্ডের একটি অংশ মাটির উপর প্রায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। কাণ্ডের এই অংশটিকে গুঁড়ি বলে। শক্ত, কাষ্ঠময়, গুঁড়িবিশিষ্ট কাণ্ডসহ বড়গাছকে বৃক্ষ বলে।

গুঁড়ির উপরের অংশ থেকে শাখাপ্রশাখা বেরোয়। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায় পাতা, ফুল ও ফল হয়।

একটি চারাগাছ অথবা বড়গাছের একটি কচি শাখা নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে পাতাগুলি কাণ্ডের গায়ে অথবা শাখায় সুন্দরভাবে সাজান থাকে। এর ফলে প্রত্যেকটি পাতা যথেষ্ট বাতাস ও সূর্যকিরণ পায়। কাণ্ডের বা শাখার যে স্থান থেকে পাতা বের হয় তাকে পর্বসন্ধি বা গাঁট বলে এবং দুইটি গাঁটের মধ্যস্থিত অংশকে পর্বমধ্য বলে। সাধারণত পাতার একটি বৃন্ত থাকে। এই বৃন্তের শেষ অংশটি একটু মোটা এবং এই মোটা অংশদ্বারা পাতা কাণ্ড বা শাখার সহিত যুক্ত। সংযোগস্থলে উপরের দিকে কাণ্ড বা শাখার সহিত পাতার বৃন্ত একটি কোণের আকার গ্রহণ করে। এই ছোট কোণের মত স্থানকে কক্ষ বলে। সাধারণত প্রত্যেক পাতার কক্ষে একটি করে মুকুল থাকে—এই মুকুলকে কক্ষমুকুল বলে। এছাড়া কাণ্ড ও তার প্রত্যেক শাখাপ্রশাখার আগায় একটি করে মুকুল থাকে—একে শীর্ষমুকুল বলে। গাছ যখন ক্রমশ বড় হয় তখন এই উভয়প্রকার মুকুল থেকেই শাখা ও পাতার সৃষ্টি হয়। যে মুকুল থেকে পাতার সৃষ্টি হয় তাকে পত্রমুকুল বলে। গাছে ফুল ফোটার সময় পাতার কক্ষে যে মুকুলগুলি দেখা যায় তা থেকেই ফুল হয়। এগুলিকে পুষ্পমুকুল বলা হয়। ফুল ফোটার পর পরাগমিলনের ফলে গাছে ফল হয়। ফলের মধ্যে বীজ থাকে।


বট গাছ

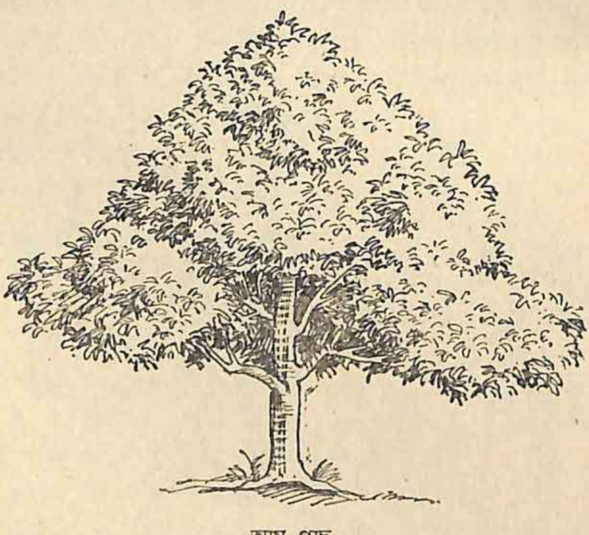




পাইন

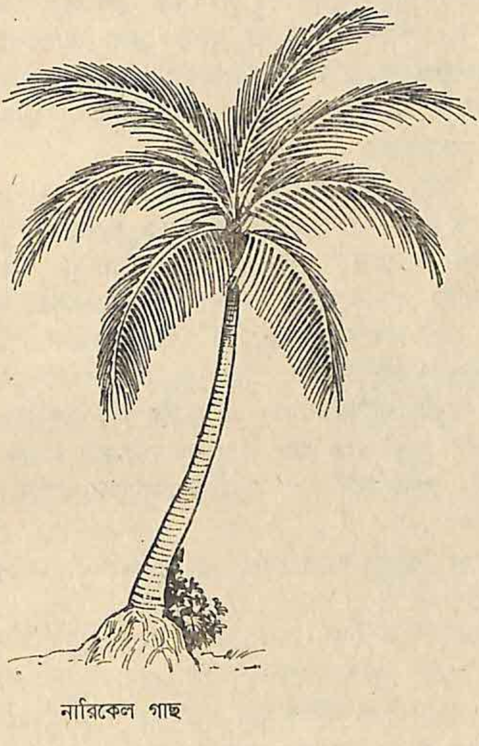
ভবিষ্যতে অনুকূল অবস্থায় এই বীজ থেকেই শিশু উদ্ভিদের জন্ম হয়।

বৃক্ষের শাখাগুলি কাণ্ডের গায়ে নিয়মমত সাজান থাকে। কাণ্ডের গায়ে শাখাসমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থানকে শাখা বিন্যাস বলে। পাতার কোলে যে পত্রমুকুল থাকে সাধারণত তা থেকেই শাখার উৎপত্তি হয়। প্রধান কাণ্ডের শীর্ষমুকুল যত বাড়ে গাছ তত দীর্ঘ হয়। শাখাপ্রশাখার শীর্ষ-মুকুল যত বাড়ে শাখাপ্রশাখাও তত বড় হয়। দেবদারু, ঝাউ প্রভৃতি গাছে প্রধান কাণ্ডের শীর্ষমুকুল দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে এইসব গাছের প্রধান কাণ্ড বেশ দীর্ঘ হয়। এই সকল গাছের কাণ্ড



আম গাছ

মোটা আর শাখাগুলি সরু এবং ছোট। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ একটু বড় হওয়ার পর এদের প্রধান কাণ্ডের শীর্ষমুকুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, সেজন্য এই গাছগুলি বেশী দীর্ঘ হয় না। শাখা-মুকুল বাড়ে বলে এদের শাখাপ্রশাখা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। কাণ্ড থেকে



নারিকেল গাছ

শাখা এবং তা থেকে বহু প্রশাখা বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছের কাণ্ড থেকে কোন শাখা বেরোয় না। এই সকল গাছ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

বৃক্ষের ত্বক্ ও শাখামুকুলের পরীক্ষা

কাণ্ডের বাহিরের আবরণকে বৃক্ষের ত্বক্ বা ছাল বলে। গাছ যখন ছোট থাকে তখন এই ত্বক্ পাতলা ও সবুজ থাকে। ছোট ছোট শাখা-প্রশাখার ত্বক্‌ও এইরূপ থাকে। গাছ যখন বড় হয় তখন কাণ্ড ও মোটা শাখাগুলির ত্বক্ আর সবুজ থাকে না। ত্বক্ বেশ পুরু হয় এবং সহজে ভিজে যায় না। কাণ্ডের ভিতরের অংশকে জল, রৌদ্রতাপ বা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করাই ত্বকের প্রধান কাজ। অনেক গাছের ত্বকে কাঁটা থাকে, সেজন্য জীবজন্তুরা এইসব গাছের কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিম প্রভৃতি গাছের ত্বক্ তিক্ত হয়।

পাতার কোণে যে কক্ষমুকুল থাকে সাধারণত তা থেকেই নূতন শাখাপ্রশাখা জন্মায়। এইজন্য এই মুকুলকে শাখামুকুলও বলা যায়। এই মুকুল যদি না বাড়ে বা কোন রকমে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এইস্থান থেকে আর নূতন শাখার সৃষ্টি হবে না। শাখামুকুলের ভিতর ভবিষ্যৎ শাখাটি খুব ছোট অবস্থায় থাকে, এর পর্বসন্ধি থেকে খুব ছোট ছোট পাতাও পর পর সাজান থাকে। শাখামুকুলটি যখন ক্রমশ বড় হয় তখন নূতন শাখা ও/তার গায়ের সাজান পাতাগুলি এক এক করে দেখা দেয়। শাখামুকুল যত বেশী হবে এবং তারা যেমন বাড়বে গাছের ডালপালাও সেই অনুসারে বেশী হবে এবং বড় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

জলের মধ্যে গাছের ডাল রেখে উহার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

কোন গাছ থেকে একটি ডাল কেটে নিলে দুই-একদিনের মধ্যেই ডালটির পাতাগুলি শুকিয়ে যায়। কিন্তু কোন জলভরা পাত্রে ডালটির গোড়া অর্থাৎ কাটা অংশ যদি ডুবিয়ে রাখা যায় পাতাসহ ডালটি তাহলে কয়েকদিন বেশ সতেজ থাকে। অনেক সময় ফুল ও কুঁড়ি সমেত ফুলের ডাল জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে ফুল ও পাতাগুলি কয়েক-দিন বেশ সতেজ থাকে, এমনকি কুঁড়ি থেকে ফুলও ফোটে। এই জলে অতি অল্প লবণ মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। কিন্তু শুধু জলে গাছের

পুষ্টিসাধন হয় না। কয়েকদিন বেশ সতেজ থাকলেও পরে পুষ্টির অভাবে ডালটি ক্রমশ শুকিয়ে যায় এবং পাতাগুলি ঝরে পড়ে। লাল রঙ গোলা জলে ফুলসমেত রজনী গন্ধার ডাঁটা ডুবিয়ে রাখলে কয়েক ঘণ্টা পরে ফুলগুলি লাল হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে গাছের কাণ্ড জল শোষণ করে পাতা ও ফুলের দিকে চালান করে।


রজনীগন্ধার ডাঁটা, রঙিন জল থেকে রঙ শোষণ করার পরীক্ষা

ফসল কাটার পদ্ধতি, উহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ধান, গম, যব, ছোলা, মটর, মসুর, সরিষা প্রভৃতি যেসব শস্য চাষ-আবাদের ফলে পাওয়া যায় সেগুলিকে সাধারণভাবে ফসল বলা হয়। এছাড়া পাট, তুলা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ থেকে পাওয়া দ্রব্যকেও ফসল বলা হয়। কৃষিজাত শস্য প্রধানত দুই প্রকার—রবিশস্য এবং খরিফশস্য। মটর, ছোলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য। এগুলি বোনার সময় শরৎকালের পর এবং এদের ফসল পাওয়া যায় শীতকালের শেষে। ধান বাংলার প্রধান খরিফশস্য। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ধান বোনা হয় এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এই ফসল পাওয়া যায়। পাট বর্ষার পূর্বে বোনা হয় এবং শরৎকালে গাছ থেকে এই ফসল সংগ্রহ করা হয়।

ফসল কাটার পদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। ফল ও বীজ পুষ্ট

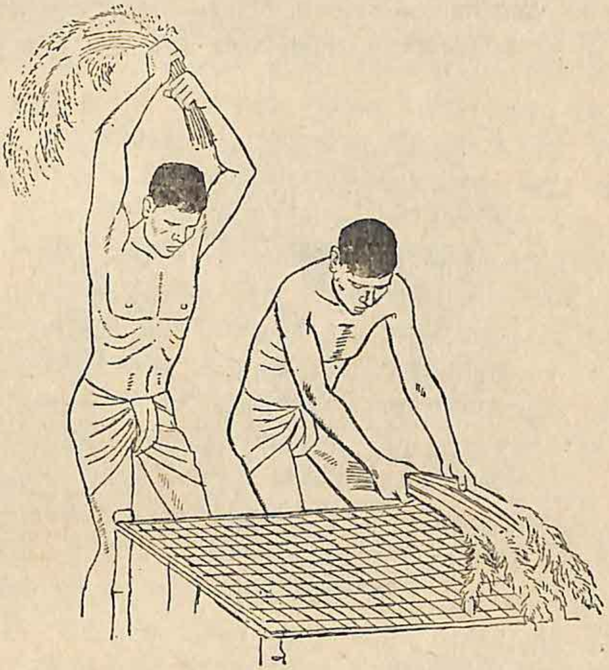
ও পরিপক্ক হলে ফসল কাটা উচিত। ঠিক সময়ে যদি ফসল না কাটা হয় তাহলে ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ধানগাছের আগার লম্বাশিষের গায়ে অনেকগুলি ধান সাজান থাকে। ধান পুষ্ট ও পরিপক্ক হলে গাছগুলি শুকিয়ে কাত হয়ে পড়ে। কৃষকেরা কাস্তের সাহায্যে ধানের শিষসমেত গাছগুলি গোড়া থেকে কেটে নিয়ে ছোট



ফসল কাটা

ছোট আঁটি বাঁধে। ফসলসহ আঁটির বোঝা গৃহে নিয়ে আসা হয়। কোন কাঠের পাটাতনের উপর আঁটির গোড়া ধরে আছাড় দিলে ধানগুলি গাছ থেকে পৃথক্ হয়ে যায়। অনেক সময় ধানগাছ মাটির উপর ছড়িয়ে দিয়ে গরু দিয়ে মাড়ান হয়। এইভাবেও ধানগাছ থেকে ধান পৃথক্ করা হয়। ধান পৃথক্ করার পর উত্তমরূপে ঝেড়ে ধান সংগ্রহ করা হয়। গাছের শুষ্ক অংশ বা খড় গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য

রাখা হয়। মুগ, মটর, সরিষা প্রভৃতি শস্যের বীজগুলি শুঁটির মধ্যে থাকে। শুঁটি শুকিয়ে গেলে ফেটে যায় এবং বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ে। এই সব শস্যের সুপক্ব শুঁটি ফেটে যাওয়ার পূর্বেই শুঁটি সমেত

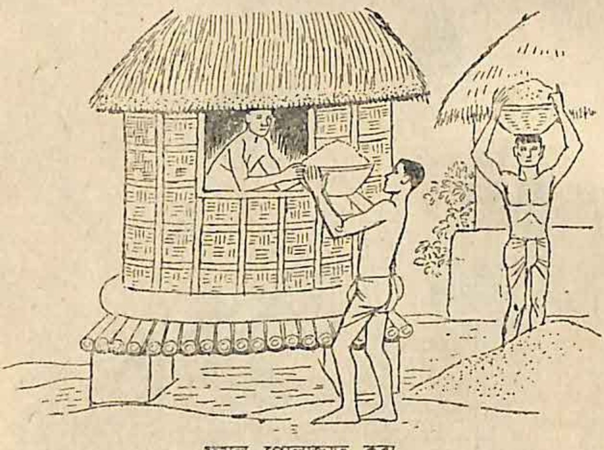


ফসল ঝাড়াই

গাছগুলি মাঠ থেকে তুলে বা কেটে নিয়ে আসা হয়। পরে মাড়াই করে, ভালভাবে ঝেড়ে ফসল পৃথক্ করা হয়।

ফসল সংগ্রহ করার পর তা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত না হলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফসল যে স্থানে সংরক্ষণ করা হবে সে স্থান শুষ্ক এবং ঠাণ্ডা থাকা অবশ্য

প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলে চাষীর গৃহে ধান মজুত রাখার জন্য গোলা বা মরাই থাকে। গোলার নিচের অংশ মাটি থেকে খানিকটা উঁচু হয়। এইজন্য জলে বা বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয় না। গোলার চালের ছাউনি টিনের না হয়ে খড়ের হলেই ভাল হয়। এতে গরম কম হয়। গোলার ভিতর বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত রাখা প্রয়োজন। পোকা যাতে ফসলের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য গোলার ফসল মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়ে



ফসল গোলাজাত করা

শুকিয়ে নেওয়া উচিত। শহর অঞ্চলে গুদামে ফসল সংরক্ষিত হয়। এইরূপ সংরক্ষিত ফসলেরও বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। গুদামে জল ঢুকে ফসলের ক্ষতি না করে সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা উচিত। গুদামের মেঝে পাকা হলেই ভাল এবং গুদাম শুষ্ক ও ঠাণ্ডা থাকা প্রয়োজন। অনেক সময় ইঁদুর বা অন্য প্রাণী ফসলের ক্ষতি করে। এইরূপ ক্ষতি যাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথা

প্রজাপতি

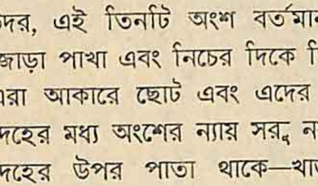
প্রজাপতির দেহ-সংলগ্ন রঙিন সুন্দর পাখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আলোয় প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। প্রজাপতি যখন কোন পাতা বা ফুলের উপর বসে তখন দুই পার্শ্বের পাখা একত্রে উপরের দিকে খাড়া অবস্থায় থাকে। দিনের বেলাতেই প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রজাপতির দেহে তিনটি অংশঃ মস্তক, বুক এবং উদর। দেহের মধ্যভাগ অর্থাৎ বুকের অংশ সরু। বুকের অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাখা বা ডানা এবং নিচের দিকে তিন জোড়া পা আছে। কয়েকটি খণ্ড পর পর যুক্ত করে এক একটি পা গড়ে উঠেছে। এইজন্য এদের যুক্তপদ (যুক্তাংশপদ) প্রাণী বলা হয়। প্রজাপতির মুখে একটি জড়ান নলের মতন শোষক থাকে। এর সাহায্যে প্রজাপতি ফুলের ভিতর থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে। মস্তকে এক জোড়া শুঙ্গ থাকে। এই শুঙ্গ দুটির শেষপ্রান্ত অপেক্ষাকৃত মোটা। প্রজাপতির পাখা নানা রঙের সমাবেশে চিত্রিত তাই সহজে সকলের চোখে পড়ে।

স্ত্রী প্রজাপতি সাধারণত গাছের পাতার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। প্রায় দশ বার দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এগুলিকে শূক বা 'লার্ভা' বলে। লার্ভাগুলির দেহ সরু সুতীক্ষ্ন শুঁয়া দ্বারা আবৃত থাকে তাই এদের শুঁয়াপোকা বলে। শুঁয়াপোকার দেহ লম্বা এবং কতকগুলি খণ্ডাংশ নিয়ে গঠিত। এদের দেহের রঙ নানা রকমের হয়। অনেক সময় অসংখ্য শুঁয়াপোকা একত্রে পাশাপাশি থাকে। গাছের কাণ্ডে বা শাখায় এইরূপে অবস্থিত শুঁয়াপোকার ঝাঁক ঐ অংশকে ঢেকে রাখে। জন্মের পর থেকেই শুঁয়াপোকা গাছের সবুজ পাতা খেতে আরম্ভ করে এবং এই অবস্থায় এরা প্রচুর আহার করে। এইভাবে শুঁয়াপোকা গাছের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। শুঁয়াপোকা

কয়েকবার খোলস ত্যাগ করে এবং পরে আহার বন্ধ করে দেহকে একটি গুটিদ্বারা আবৃত করে। শরীর থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়ে এই গুটি প্রস্তুত হয়। গুটির ভিতরে শূক বা লার্ভা আকারে পরিবর্তিত হয়ে পিউপা বা পুত্তলী অবস্থায় পরিণত হয়। পুত্তলী অবস্থায় এরা স্থির হয়ে থাকে এবং কিছুই আহার করে না। এই সময় দেহের গঠনের পরিবর্তন হয়। পিউপা ক্রমশ প্রজাপতির আকার ধারণ করে। পরে গুটি ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে।

গুটিপোকা বা রেশম মথ

রেশম মথ প্রজাপতি শ্রেণীর পতঙ্গ। সাধারণত এরা নিশাচর। প্রজাপতির ন্যায় রেশম মথ বা গুটিপোকার দেহেও মস্তক, বুক ও উদর, এই তিনটি অংশ বর্তমান। বুকের অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাখা এবং নিচের দিকে তিন জোড়া (যুক্তাংশপদ) যুক্তপদ থাকে। এরা আকারে ছোট এবং এদের শরীরের মধ্য অংশ মোটা—প্রজাপতির দেহের মধ্য অংশের ন্যায় সরু নয়। মথ যখন কোথাও বসে তখন পাখা দেহের উপর পাতা থাকে—খাড়া থাকে না। মথের দেহ বা পাখা প্রজাপতির ন্যায় রঙিন হয় না। মথের মুখে ফুলের মধু সংগ্রহ উপযোগী কোন গঠন নেই। মস্তকে যে এক জোড়া শুঙ্গ থাকে তার শেষপ্রান্ত সরু, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা।



গুটিপোকা, শূক এবং গুটি

তুঁত, পেয়ারা, কুল, পলাশ প্রভৃতি গাছের পাতায় স্ত্রীমথ ডিম পাড়ে। একটি মথের ডিমের সংখ্যা সহস্রাধিক। ডিমগুলি সাদা, অতিশয় ক্ষুদ্র এবং গোলাকার। আট থেকে আঠার দিন পরে ডিম থেকে লার্ভা বা শূক বেরোয়। এগুলিকে 'পলু' বলে। পলুর রঙ সবুজ। জন্মাবার পর থেকেই পলু গাছের

পাতা খেতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় এরা প্রচুর আহার করে এবং একুশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন অতিবাহিত করে। এই সময়ের মধ্যে পলু প্রায় পাঁচবার খোলস ত্যাগ করে। পরে আহার বন্ধ করে এগুলি গুটি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। পলুর মুখ থেকে নিঃসৃত রস রেশম সুতার আকার ধারণ করে এবং এই সুতা গায়ে জড়িয়ে গুটি তৈরী হয়। গুটি প্রস্তুত করতে প্রায় তিন দিন সময় লাগে। গুটির ভিতর এরা স্থির হয়ে আট থেকে আঠার দিন সময় কাটায়। গুটির ভিতর পলুর রূপান্তর হয়ে পিউপা বা পুত্তলী হয়। পুত্তলী অবস্থায় এরা আর আহার করে না। পরে গুটি ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে। মথ সাধারণত ছয় সাত দিন বেঁচে থাকে।

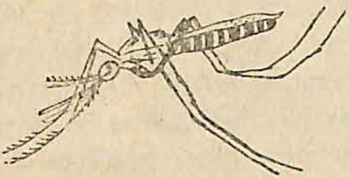
গুটির আকার কাগজি লেবুর ন্যায়। গুটি বেষ্টন করে প্রায় পাঁচ শত গজ রেশমের সুতা থাকে। গুটি ভেদ করে মথ বেরিয়ে এলে অনেক রেশম সুতা নষ্ট হয়, সেজন্য মথ বেরিয়ে আসার পূর্বেই গুটিগুলি পাঁচ মিনিটকাল গরম জলে সিদ্ধ করে ভিতরের পিউপা বা মথকে মেরে ফেলা হয়। পরে গুটি থেকে রেশমের সুতা বের করে নেওয়া হয়।

মশা

সাধারণত আমরা দুই প্রকার মশা দেখতে পাই—এনোফিলিস ও কিউলেক্স। এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া এবং কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে মনুষ্য দেহে সেই জীবাণু সংক্রামিত করে। অন্ধকার স্থান এদের প্রিয়। মশা সাধারণত রাত্রিকালে বের হয়। মশাও (যুক্তাংশপদ) যুক্তপদ প্রাণী। এদের দেহেও তিনটি অংশ—মস্তক, বুক এবং উদর। বুকের অংশে উপরের দিকে এক জোড়া মাত্র পাতলা ডানা এবং নিচের দিকে তিন জোড়া পা আছে। মশা ওড়ার সময় পোঁ পোঁ শব্দ পাওয়া যায়। এই সময় ডানা জোড়া দ্রুত নড়ে বলে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। মশার মস্তকটি গোলাকার এবং এর সঙ্গে এক জোড়া শুঙ্গ সংলগ্ন। মুখে একটি নলের আকারের শোষক থাকে।

স্ত্রী মশার এই নলের অগ্রভাগ সূচল। স্ত্রী মশা এর সাহায্যে দংশন করে এবং রক্ত পান করে। পুরুষ মশার এই নলের অগ্রভাগ সূচল নয়, এজন্য এগুলি দংশন করতে প্রারে না—এরা রক্তপান থেকে বঞ্চিত। পুরুষ মশা গাছের রস পান করে।

বসবার ধরন দেখে এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশা সহজে চেনা যায়। এনোফিলিসের দেহ বসবার স্থানের সঙ্গে একটি কোণের সৃষ্টি করে এবং এর শোষক নল ও উদরের অংশ এক সরলরেখায় থাকে কিন্তু কিউলেক্সের দেহ বসবার স্থানের সহিত প্রায় সমান্তরাল থাকে এবং এর শোষক নল ও উদরের অংশ এক সরলরেখায় থাকে না—সামান্য



এনোফিলিস মশা



কিউলেক্স মশা

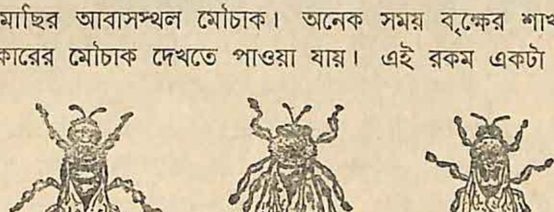
কোনাকুনিভাবে অবস্থান করে। এনোফিলিসের ডানায় ছিট ছিট দাগ থাকে কিন্তু কিউলেক্সের ডানায় এইরকম দাগ নেই।

স্ত্রী মশা সাধারণত স্থির বদ্ধ জলে অথবা পরিষ্কার পুকুরের জলে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং সাদা—এরা জলে ভেসে থাকে। এনোফিলিসের ডিমগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ভাসে কিন্তু কিউলেক্সের ডিমগুলি একত্রে জোট বেঁধে ভেসে বেড়ায়। এইরূপ একটি জোটে প্রায় তিন চার শত ডিম থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে শূক বা লার্ভা বেরোয়। লার্ভাগুলি জলের উপরিভাগে ভেসে থাকে। লার্ভাগুলি লম্বা; মস্তক সামান্য চেপ্টা, দেহের অপর অংশ গোল। এনোফিলিসের লার্ভা জলের উপরতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে কিন্তু কিউলেক্সের লার্ভা মস্তক নিচের দিকে রেখে জলের উপরতলের সঙ্গে কোনাকুনিভাবে অবস্থান করে। লার্ভার দেহের পিছন দিকে বায়ু

প্রবেশের জন্য রন্ধ্রপথ থাকে। এইজন্য লার্ভাগুলি মাঝে মাঝে জলের উপরতলের কাছে এসে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করে ও দেহের দূষিত বায়ু বের করে দেয়। জলে কেরোসিন বা ঐ জাতীয় কোন তেল দিলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং লার্ভাগুলি মারা পড়ে। এই উপায়ে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। লার্ভা অবস্থায় এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ্ আহার করে। লার্ভা তিন চারবার খোলস ত্যাগ করে এবং ক্রমশ আকারে বড় হয়। লার্ভা বা শূক অবস্থায় প্রায় পনের দিন অতিবাহিত করার পর পিউপা বা পুত্তলী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পিউপার দেহ বঁড়শির মত বাঁকা। এই অবস্থায় এরা কিছু আহার করে না, অধিকাংশ সময় জলের উপরতলের ঠিক নিচে অবস্থান করে। পিউপার মস্তক বেশ মোটা এবং এই অংশের অল্প পিছনে এক জোড়া বায়ু নল থাকে। এই নলের সাহায্যে শ্বাসকার্যের জন্য জলের বাইরে থেকে বাতাস গ্রহণ করে। প্রায় চারদিন পরে পিউপার ত্বক্ ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ মশা বেরিয়ে জলের উপর আসে। নবজাত মশা জলে ভাসমান পরিত্যক্ত খোলসের উপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এবং ডানাগুলি শুকিয়ে নেয়। এর পর পূর্ণাঙ্গ মশা ডানা মেলে উড়ে যায়।

মৌমাছি

মৌমাছির আবাসস্থল মৌচাক। অনেক সময় বৃক্ষের শাখায় বেশ বড় আকারের মৌচাক দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম একটা মৌচাকে

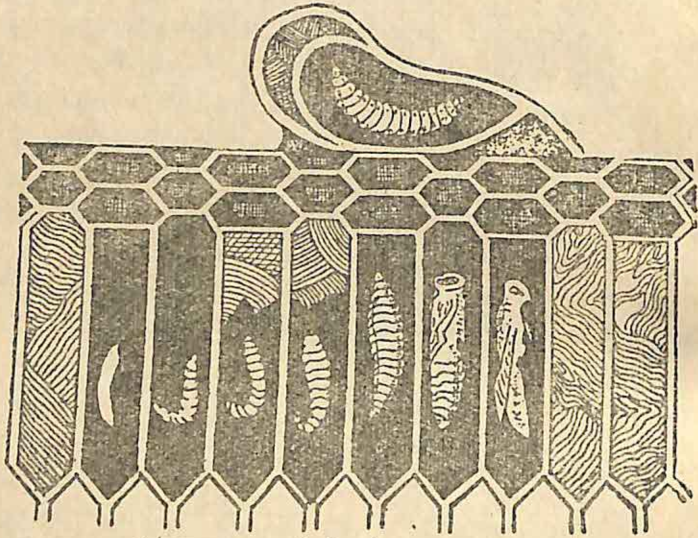


রানী পুরুষ শ্রমিক

মৌমাছির সংখ্যা পঁচিশ ত্রিশ হাজারের বেশী হয়। মৌমাছিও একটি

(যুক্তাংশপদ) যুক্তপদ পতঙ্গ। মৌমাছির দেহেও তিনটি অংশ—মস্তক, বুক এবং উদর। বুকের অংশের উপরের দিকে দুই জোড়া ডানা এবং নিচের দিকে তিন জোড়া পা থাকে।

মৌচাকে শ্রমিক, পুরুষ ও রানী—এই তিন প্রকার মৌমাছি থাকে। একটি বড় মৌচাকে সাধারণত একটি রানী ও প্রায় দুইশত পুরুষ থাকে। বাকি কয়েক হাজার সবই শ্রমিক। মৌচাকে যে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ



মৌচাকের মধ্যে মৌমাছির ডিম, শূককীট ও গুটি

থাকে তার প্রায় সবগুলিই সমান। প্রত্যেকটি গভীর গর্তবিশেষ এবং প্রত্যেকটির মুক্তপথ ছয়কোণবিশিষ্ট। যে প্রকোষ্ঠে রানী বাস করে সেটির আকার বেশ বড়। মৌচাক থেকে মধু ও মোম পাওয়া যায়। একটি মৌচাকে শ্রমিক, পুরুষ ও রানী একত্রে মিলে মিশে বাস করে। মৌমাছির এই সুসংবদ্ধ সামাজিক জীবন বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

রানী মৌমাছি আকারে বড়। রানী মৌমাছির উদরের অংশ লম্বা এবং পিছনের দিকে **ক্রমশ সরু**। উদরের পশ্চাৎভাগে একটি ছোট হুল

থাকে এবং এটি একাধিকবার ব্যবহার করতে পারে। রানী মৌমাছি বহুদিন যাবৎ বেঁচে থাকে এবং অগণিত ডিম পাড়ে; তা থেকেই অন্যান্য মৌমাছির জন্ম হয়। পুরুষ মৌমাছির আকার রানী ও শ্রমিকের মাঝামাঝি। এদের শরীর অপেক্ষাকৃত চওড়া। পুরুষ মৌমাছির চক্ষু দুইটি বেশ বড় হয়। এদের উদর-সংলগ্ন কোন হুল থাকে না। মৌচাকের উপযোগী কোন কার্যই এরা করে না। শ্রমিক মৌমাছি অসম্পূর্ণ স্ত্রী মৌমাছি এবং আকারে ছোট। এদের উদরের পিছনের দিকে হুল থাকে। এরা যখন হুল ফোটায় তখন হুলটি মৌমাছির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষতস্থানে থেকে যায় ও মৌমাছিটির মৃত্যু হয়। মৌমাছির হুলের সঙ্গে বিষ ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে, সেইজন্য ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে এবং ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়। শ্রমিক মৌমাছি মাত্র পাঁচ ছয় সপ্তাহ বেঁচে থাকে। মৌচাকে যাবতীয় শ্রমের কাজ শ্রমিকরা করে। মৌচাক নির্মাণ ও পরিষ্কার ও রক্ষা করা, মৌচাকে বায়ু সঞ্চালন, ফুলের মধু আহরণ করে সেই মধুকে পরিবর্তিত করে মৌচাকে সংগ্রহ করা, ফুলের পরাগ, জল প্রভৃতি সংগ্রহ করা এবং শিশু অবস্থায় মৌমাছির আহারদান ও প্রতিপালন প্রভৃতি সকল কাজই শ্রমিকরা করে।

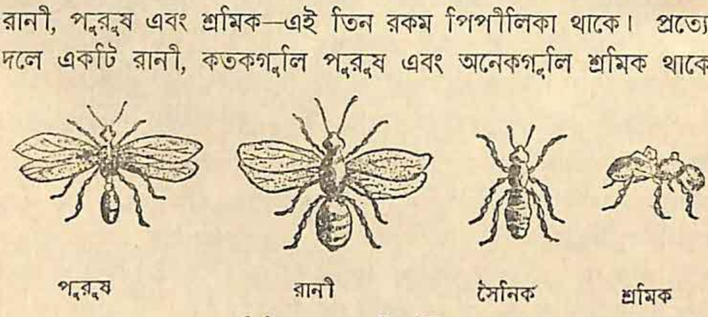
মৌচাকে একমাত্র রানীই ডিম পাড়ে। মৌচাকের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একটি করে ডিম রেখে রানী তার কর্তব্য শেষ করে। প্রায় তিনদিন পরে ডিম ফুটে শূক বা লার্ভা বেরোয়। ডিম ও তা থেকে যে বাচ্চা বা শূক জন্মায় তার তত্ত্বাবধান করে শ্রমিক মৌমাছি। শূক অবস্থায় এদের পরাগ ও মধু মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। শূক অবস্থায় ছয় সাতদিন কাটে; পরে পিউপা বা পুত্তলী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই সময় এরা কিছু আহার করে না। পুত্তলী অবস্থায় প্রায় দুই সপ্তাহ কাটে। পরে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বেরিয়ে আসে। ডিম ফুটে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি হতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

মৌমাছিরা ফুলের মিষ্ট রস ও পরাগ আহরণ করে। মৌচাকে যে মধু জমা থাকে তা ফুলের মধু নয়। শ্রমিক মৌমাছি ফুলের মিষ্ট রস নিজের খাদ্যনালীতে জমা করে। সেখানে পরিপাক হয়ে এই রস মধুতে পরিবর্তিত হয়। মৌচাকে ফিরে এসে শ্রমিকরা এই মধু উদ্গিরণ

করে মৌচাকের প্রকোষ্ঠে ঢেলে দেয়। মধুর জলীয় অংশ কমে যাওয়ার পর প্রকোষ্ঠের মুখগুলি মোম দিয়ে বন্ধ করে দেয়। ফুলের পরাগ মৌমাছির খাদ্য। শুকগুলি ছাড়া অন্যান্য শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছিকে এই পরাগ খাদ্যরূপে দেওয়া হয়। ফুলের মিষ্ট রস ও পরাগ না হলে মৌমাছির চলে না। এইজন্য যেখানে বেশী ফুল পাওয়া যায় তার নিকটেই মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে। অনেক সময় কোন কোন বিশেষ ফুলের গন্ধ মধুতে পাওয়া যায়। ঐ রকম বিশেষ ফুলের মিষ্ট রস থেকে মধু হয় বলে মধুতে ঐ গন্ধ পাওয়া যায়। শ্রমিক মৌমাছির পেটের নিচের দিকে একটি গঠন থেকে মোম বের হয়। এই মোম দিয়ে মৌচাকের প্রকোষ্ঠগুলি তৈরি করা হয়। উদ্ভিদের কোমল অংশ থেকে আঠাজাতীয় বস্তু সংগ্রহ করে শ্রমিকেরা মৌচাকর ফাটল ও ছিদ্র সংস্কার কর।

পিপীলিকা

ছোট বড় নানা আকারের ও নানা রঙের পিপীলিকা আমরা দেখি। মৌমাছির ন্যায় এরাও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। প্রত্যেক দলে স্ত্রী বা রানী, পুরুষ এবং শ্রমিক—এই তিন রকম পিপীলিকা থাকে। প্রত্যেক দলে একটি রানী, কতকগুলি পুরুষ এবং অনেকগুলি শ্রমিক থাকে।



বিভিন্ন প্রকার পিপীলিকা

আমরা যেগুলি দেখতে পাই সেগুলি শ্রমিক। পিপীলিকা সাধারণত মাটির ভিতর গর্তে বাস করে। অনেক সময় গাছের পাতার তৈরী ঘরে অথবা গাছের কোটরেও এরা বাস করে। পুরাতন বাসগৃহ যদি জলে নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় বা মেরামতের অযোগ্য হয় অথবা যদি বাসায়

জায়গার অভাব হয় তাহলে দলের সকলে মিলে অন্যস্থানে গিয়ে নূতন বাসা তৈরি করে। পুরাতন বাসা পরিত্যাগ করার সময় ডিম, শিশু ও সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য সব সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

পিপীলিকার দেহে তিনটি অংশ—মস্তক, বুক ও উদর। পুরুষ এবং রানী পিপীলিকার বুকের অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাতলা ডানা থাকে। শ্রমিকের ডানা থাকে না। বুকের অংশে নিচের দিকে সকলেরই তিন জোড়া (যুক্তাংশপদ) যুক্তপদ থাকে। পিপীলিকার চোয়াল জোড়া খুব শক্ত। এর সাহায্যে পিপীলিকা খাদ্যদ্রব্য টুকরা করে খায় এবং আত্মরক্ষার জন্য কামড়ায়। রানী আকারে বেশ বড়, পুরুষগুলি মাঝারি এবং শ্রমিকরা সবচেয়ে ছোট। রানী সাধারণত বাসার বাইরে আসে না। রানীর কাজ কেবল ডিম পাড়া। পুরুষরা অত্যন্ত অলস, দলের কোন কাজই তারা করে না। শ্রমিকরাই দলের সব কাজ করে। বাসগৃহ মেরামত ও পরিষ্কার করা, রানীর পরিচর্যা করা, সন্তান লালন-পালন করা, খাদ্য সংগ্রহ করা, এমনকি ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করাও শ্রমিকদেরই কাজ। অনেক সময় অন্য দলের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা বা অন্য দলের সঞ্চিত খাদ্য, ডিম প্রভৃতি লুঠ করে আনার কাজও শ্রমিকরা করে। পিপীলিকা নিজের দেহ অপেক্ষা বহুগুণ ভারী দ্রব্য বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম।

পিপীলিকার ডিমগুলি সাদা এবং ছোট ছোট। ডিম ফুটে যে কৃমির মত বাচ্চা হয় তাকে শূক বলে। কিছুদিন পরে শূকের দেহের চারিদিকে একটি আবরণ হয়। এই অবস্থায় একে পিউপা বা পুত্তলী বলা হয়। পরে পিউপার আবরণ ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা বেরোয়।

রানী পিপীলিকা প্রায় বিশ বৎসর বেঁচে থাকে। পুরুষ বা শ্রমিকরা অধিকদিন বাঁচে না।

ব্যাঙ

ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে, নর্দমায়, ভাঙ্গা প্রাচীরের কোলে বা যেখানে মাটি নরম সেই সব জায়গায় একপ্রকার ব্যাঙ বাস করে। এদের গায়ের

রঙ্ ধূসর এবং ত্বক্ খসখসে। পিঠের দিকে ত্বকের উপর অসংখ্য ছোট ছোট গুটি থাকে। এগুলিকে কুনো ব্যাঙ বলে। রাত্রির অন্ধকারে এরা খাদ্য অন্বেষণে বেরোয়। আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ব্যাঙ সাধারণত জলে বাস করে। এগুলির দেহ মসৃণ ও পিচ্ছল। এদের দেহে পিঠের দিকে কাল ও হলদে রঙের লম্বালম্বি দাগ থাকে। পেটের রঙ ফিকে হলদে এবং এই দিকে কোন দাগ থাকে না। এগুলির মুখ অপেক্ষাকৃত সরু। এইগুলিকে সোনা ব্যাঙ বলে। সাধারণত আমরা এই দুইপ্রকার ব্যাঙ দেখি।

ব্যাঙের শরীরে মস্তক ও ধড় এই দুইটি অংশ। মাঝখানে গলা বলে কিছু নেই। ব্যাঙের লেজও নেই। ধড়ের সঙ্গে দুই জোড়া পা আছে।



সোনাব্যাঙ



কুনোব্যাঙ

সামনের পা দুটি ছোট, পিছনের জোড়া বেশ বড়। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ব্যাঙ বেশ জোরে লাফাতে পারে। সামনের প্রত্যেক পায়ে চারটি করে এবং পিছনের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করে আঙ্গুল থাকে। পিছনের পায়ের আঙ্গুলগুলি হাঁসের পায়ের পাতার মতন পাতলা চামড়ার সাহায্যে জোড়া। জলে সাঁতার দেওয়ার পক্ষে এই রকম পা বিশেষ সহায়ক। ব্যাঙের মাথায় এক জোড়া চক্ষু, এক জোড়া কর্ণপটহ ও এক জোড়া নাসিকা ছিদ্র আছে।

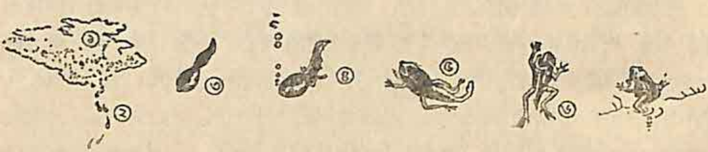
কীটপতঙ্গ, শামুক, কেঁচো প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী ব্যাঙের খাদ্য। আহার্য সংগ্রহের সময় ব্যাঙ মুখের ভিতর থেকে জিহ্বা বের করে

আহার্য কীটপতঙ্গের দেহের উপর স্থাপন করে। জিহ্বায় আঠার মত লালা মাখান থাকে, ফলে এগুলি জিহ্বার সঙ্গে লেগে যায়। পরে আহার্যসহ জিহ্বাটি মুখের ভিতর টেনে নেয়। ব্যাঙ খাদ্য চর্বণ করে না—গিলে ফেলে। কেঁচো প্রভৃতি একটু বড় আকারের খাদ্য চোয়ালের সাহায্যে ধরে ধীরে ধীরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেলে। আহার-যোগ্য প্রাণী জীবন্ত না হলে বা নড়াচড়া না করলে ব্যাঙ তা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে না।

শীতকালে ব্যাঙ মাটির নিচে আশ্রয় নেয়। এই সময় এরা আহার করে না। শীতের আগে প্রচুর আহার করার ফলে দেহে যে চর্বি সঞ্চিত থাকে তাতেই পুষ্টিসাধন হয়। সারা শীতকাল এইরূপ নির্জীব অবস্থায় যেন ঘুমিয়ে কাটায়। একেই ব্যাঙের শীতঘুম বলে। গ্রীষ্মে এবং বর্ষায় এরা আবার বিশেষ সজীব হয়ে ওঠে এবং খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় বের হয়।

বর্ষাকালে ব্যাঙ ডিম ছাড়ে। এই সময় জলাশয়ের ধারে ব্যাঙের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। সোনা ব্যাঙ জলেই বাস করে। ডিম ছাড়ার সময় কুনো ব্যাঙও জলে আশ্রয় নেয়। স্ত্রী ব্যাঙ যে কোন জলাশয়ের কিনারায় জলের ভিতর যে আগাছা বা ডালপালা থাকে তার কাছেই ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো ক্ষুদ্র এবং গোলাকার। এর একটা অংশ সাদা ও বাকি অংশ কাল। কুনো ব্যাঙের ডিমগুলি একটা জড়ান জেলির দড়ির মত জিনিসে একটার পর আরেকটা এইভাবে সাজান থাকে। সোনা ব্যাঙের ডিমগুলি থলথলে জেলির মত জিনিসে ছড়ান থাকে। কয়েক-দিন পরে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়। ব্যাঙাচির দেহে দুইটি অংশ—একটি মাথাসহ ধড় ও অপরটি ধড়ের পিছনে যুক্ত লেজ। লেজটি পাতলা এবং ধড়ের সঙ্গে খাড়াভাবে লাগান থাকে। প্রথমে এদের চোখ, মুখ বা পা কিছুই থাকে না, শুধু ধড়ের আগায় একটি চোষকগঠন বা 'সাকার' থাকে। জলের ভিতর কোন ডাল বা পাতার গায়ে চোষকগঠনের সাহায্যে সংলগ্ন অবস্থায় কয়েকদিন চুপ করে থাকে। এই অবস্থায় এরা কিছুই আহার করে না। এই সময় মাথার দুইধারে ছোট ছোট ফুলকা দেখা যায়। এই ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। ক্রমে

ব্যাঙাচির চোখ ও মুখ হয় এবং পরে মলদ্বারও দেখা যায়। এই সময় এরা লেজের সাহায্যে জলে দ্রুত সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। পরে ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে পিছনের পা দুইটি ছোট আকারে দেখা দেয়। এর পর মাথার ফুলকো লোপ পায় এবং মুখের ভিতর দুই পাশেই মাছের মতন ফুলকা দেখা দেয়। ব্যাঙাচি মুখের ভিতরের ফুলকার সাহায্যে মাছের মত জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। এই অবস্থায় ব্যাঙাচির পেটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে খাদ্যনালীটি



ব্যাঙাচির রূপান্তর

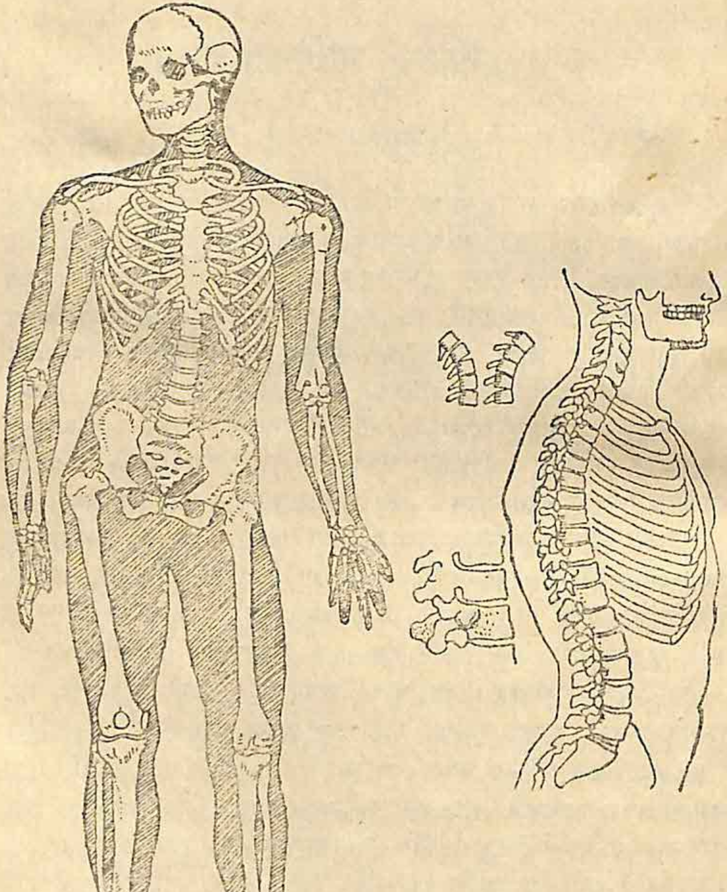
ঘড়ির স্প্রিং-এর মত গোলভাবে জড়ান রয়েছে। এই সময় ব্যাঙাচি জলজ উদ্ভিদের অংশ আহার করে। পিছনের পা দুটি ক্রমশ বড় হয় এবং পরে ধড়ের সামনের অংশ থেকে সম্মুখের পা দুটি বের হয়। দুই জোড়া পা হওয়ার পরেও এদের লেজ থেকে যায়। তারপর শরীরের ভিতর ফুসফুস জন্মায় এবং খাদ্যনালীরও পরিবর্তন হয়। এটি লম্বায় ছোট হয়ে যায় এবং লতাপাতার টুকরার পরিবর্তে কীটপতঙ্গ খাওয়ার উপযোগী হয়। এই সময় কিছুদিন ধরে ব্যাঙাচি ফুলকা এবং ফুসফুস উভয়ের সাহায্যেই শ্বাসকার্য চালায়। পরে মুখের ভিতরের ফুলকাগুলি লোপ পায় ও ফুসফুসই শ্বাসকার্য চালায়। ফুসফুস সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হওয়ার পর শ্বাসকার্যে বাতাসের অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য এবং আহার সংগ্রহের জন্য ব্যাঙাচিরা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। লেজটি ছোট আকারে তখনও থাকে পরে ক্রমশ ছোট হয়ে লোপ পায়। এইভাবে ব্যাঙাচি ছোট আকারের ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। ডিম ফুটে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরিত হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।

মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান

মানবদেহ

মানুষের দেহে প্রধান অংশ দুইটিঃ (১) মস্তক এবং (২) দেহকান্ড বা ধড়। যে ছোট সরু অংশ মস্তককে ধড়ের সঙ্গে যুক্ত করে সেই অংশটি গলা। ধড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে এক জোড়া হাত ও এক জোড়া পা। পা দুইটির সাহায্যেই মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং চলাফেরা করতে পারে। দেহকান্ডের মাথার দিকের অংশটি বক্ষ এবং নিচের দিকের অংশটি উদর। দেহকান্ডের ভিতরে গহবর থাকে। বক্ষের অংশে গহবরের ভাগকে বক্ষোগহবর এবং উদরের অংশে গহবরের ভাগকে উদরগহবর বলা হয়। মাঝখানে অবস্থিত একটি পেশীর পর্দা গহবর দুইটিকে পৃথক্ করে রাখে। এই পেশীর পর্দাকে মধ্যচ্ছদা বলে।

দেহের ভিতরে একটা হাড়ের কাঠামো আছে। এই শক্ত কাঠামোকে অবলম্বন করেই মানবদেহ গঠিত। কাঠামো বা কঙ্কালটিতে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের হাড় আছে। কঙ্কালের দুইটি প্রধান অংশ মাথার খুলি ও মেরুদন্ড। মেরুদন্ডটি গলা এবং দেহকান্ডের ঠিক মাঝ বরাবর পিঠের দিকে অবস্থিত। মেরুদন্ডে কতকগুলি ছোট হাড় পর পর সাজান আছে। বুকের অংশকে দুই পাশ থেকে রক্ষা করছে কতকগুলি হাড়—এগুলিকে পাঁজরা বলে। প্রত্যেক পাশে পাঁজরার হাড়গুলি পর পর সাজান। প্রত্যেকটি হাত এবং পায়েও হাড়ের কাঠামো রয়েছে। হাত এবং পা-এর প্রত্যেকটিতে তিনটি করে অংশ থাকে। বাহু, অগ্রবাহু ও কর—এই তিনটি হাতের অংশ। করের অংশে কব্জি, করতল ও পাঁচটি আঙ্গুল আছে। পায়ের অংশ তিনটি যথাক্রমে—উরু, জঙ্ঘা ও চরণ বা পদ। চরণের অংশে রয়েছে গোড়ালি, পায়ের পাতা এবং পাঁচটি আঙ্গুল। হাত এবং পায়ের প্রত্যেকটি অংশে এক বা একাধিক হাড় আছে। ছোট বা বড় হাড়গুলি পরস্পর এমনভাবে লাগান যে কাঠামোটির যে কোন অংশ ইচ্ছামত সঞ্চালন করা যায় এবং আমরা



মানবদেহের কাঠামো

প্রয়োজনমত নড়াচড়া বা চলাফেরা করতে পারি। কেবল মাথার খুলির হাড়গুলি পরস্পর এমনভাবে জোড়া যে হাড়গুলি অচল ও স্থির হয়ে থাকে।

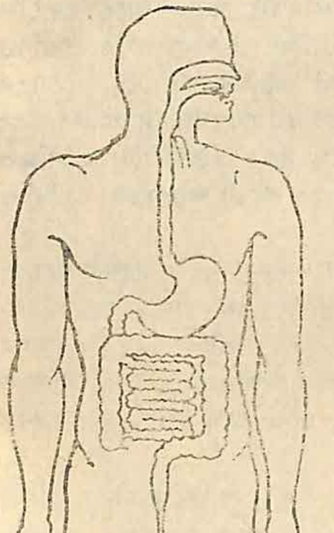
হাড়ের কাঠামো বা কঙ্কালের উপর সাজান থাকে পেশী। এছাড়া দেহের ভিতরকার অনেকগুলি গঠনেও পেশী থাকে। পেশীগুলি সংকোচনশীল। হাড়ের সঙ্গে যে পেশীগুলি জোড়া থাকে সেগুলি ঐচ্ছিক পেশী। এই পেশীগুলি মানুষ ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারে। এর ফলেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করা যায়। দেহের ভিতরের বিভিন্ন যন্ত্র বা নরম অংশগুলিতে যে সব পেশী থাকে সেগুলির সংকোচন ও প্রসারণ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এইগুলিকে অনৈচ্ছিক পেশী বলা হয়। খাদ্যনালী বা মূত্রাশয়ের পেশী অনৈচ্ছিক। হাত ও পায়ের পেশীগুলি ঐচ্ছিক।

সারা দেহের উপরে একটা আবরণ আছে। এইটা গায়ের চর্ম বা ত্বক্। ত্বক্ পেশীগুলিকে এবং দেহের ভিতরের অন্যান্য নরম অংশ-গুলিকে রক্ষা করে। ত্বকে অনেক ছিদ্র থাকে। এইসব ছিদ্রপথে দেহের ময়লা ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়। ত্বকে অসংখ্য লোম থাকে। ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চাপ, স্পর্শ, তাপ, ব্যথা ইত্যাদির অনুভূতি হয়।

মানবদেহে মস্তকের অংশে যে হাড়ের কাঠামো রয়েছে তাকে করোটি বলে। করোটি বা মাথার খুলির ভিতর থাকে মস্তিষ্ক। করোটির উপরেও ত্বকের আবরণ রয়েছে এবং এর মাথার অংশে থাকে কেশরাশি। মস্তকের সামনের দিকে অর্থাৎ মুখমণ্ডলে রয়েছে এক জোড়া চক্ষু, এক জোড়া কর্ণ ও এক জোড়া নাসিকাছিদ্র। নাসিকার ঠিক নিচেই মুখ। মুখের উপরে ও নিচে ঠোঁট। মুখগহ্বরে উপরে এবং নিচে দুইটি চোয়াল বা মাড়ি। এর প্রত্যেকটিতে থাকে এক পাটি দাঁত। মানুষের শৈশব অবস্থায় যে দাঁতগুলি হয় সেগুলি ছয় সাত বছরের পর পড়তে আরম্ভ করে। এগুলিকে বলে দুধে দাঁত। দুধে দাঁত পড়ে যাওয়ার পর স্থায়ী দাঁত উঠে। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দাঁত ওঠা শেষ হয়। উপরে এবং নিচে প্রত্যেক পাটিতে ষোলটি স্থায়ী দাঁত হয়।

খাদ্যদ্রব্য টুকরা করা, চিবান ও পেষণ করা হয় দাঁতের সাহায্যে। মুখের ভিতরে থাকে জিহ্বা। এর উপরতলে কতকগুলি গুটি আকারের গঠন থাকে। এই গঠনগুলির সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি হয়।

মুখগহ্বরের পিছন থেকে দুটি নালী গলার অংশ দিয়ে দেহকাণ্ডের মধ্যে যায়। এর একটি খাদ্যনালী অপরটি শ্বাসনালী। খাদ্যনালী শ্বাসনালীর পিছনে থাকে। শ্বাস-নালীর মুখে একটি ঢাকনা থাকে যাতে খাদ্য গ্রহণের সময় খাদ্যদ্রব্য শ্বাসনালীতে প্রবেশ না করতে পারে।



মানবদেহের খাদ্যনালী

দেহকাণ্ডে বুকের অংশে যে গহ্বর রয়েছে তার মধ্যে দুইপাশে দুইটি ফুসফুস আছে এবং ঐ দুইটির মাঝখানে একটু বাঁদিকে থাকে হৃদ্‌যন্ত্র। গলার ভিতর দিয়ে শ্বাসনালীটি এসে বুকের অংশে ঢোকে এবং দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে ফুসফুস দুটিতে যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে রক্তবহা নালী— শিরা ও ধমনী। খাদ্যনালীটি বুকের অংশের ভিতরে হৃদ্‌যন্ত্রের পিছন দিয়ে গিয়ে মধ্যচ্ছদা ভেদ করে উদরগহ্বরে প্রবেশ করে। বুকের অংশে যে পাঁজরাগুলি রয়েছে সেগুলি একটা খাঁচার মতন—বুকের ভিতরে অবস্থিত ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি দেহযন্ত্রগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে।

উদরগহ্বরে ঢুকে খাদ্যনালী পাকস্থলীতে পৌঁছায়। মুখগহ্বর থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্যনালীর অংশকে গ্রাসনালী বলা হয়। পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীর অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র উদরগহ্বরে

অবস্থিত। বৃহদন্ত্রের শেষে পায়ু বা মলদ্বার। এই পথে খাদ্যের অজীর্ণ অংশ মলরূপে বেরিয়ে যায়। খাদ্যনালীর অংশগুলি ছাড়াও উদরগহবরে থাকে যকৃৎ, পিত্তস্থলী, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, বৃক্ক, মূত্রাশয় প্রভৃতি।

মুখগহবর থেকে খাদ্যনালী আরম্ভ হয় এবং মলদ্বার বা পায়ুতে গিয়ে শেষ হয়। দাঁতের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য টুকরো টুকরো করে পেষণ করা হয়। এই সময় মুখের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস বা লালা খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্য গিলিবার ও পরিপাকের সাহায্য করে। গিলিবার পর এই খাদ্য গ্রাসনালীর পথে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায়। এখানে জারক রসের সাহায্যে খাদ্য কতকটা পরিপাক হয়। পাকস্থলী থেকে খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্গে যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের সংযোগ আছে। পিত্তস্থলীতে যকৃতের রসপিত্ত জমা থাকে। পিত্ত ও অগ্ন্যাশয়ের জারক রস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে জীর্ণ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গা থেকেও জারক রস এসে পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অবস্থিত অসংখ্য জালকনালীর পথে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেই রক্ত এই জীর্ণ খাদ্য শোষণ করে। খাদ্যের অবশিষ্ট অসার ও অজীর্ণ অংশ বৃহদন্ত্রে এসে পৌঁছায়। বৃহদন্ত্রে জলীয় অংশ শোষিত হয়। পরে অবশিষ্ট অংশ মলরূপে পায়ুর পথে বেরিয়ে যায়। খাদ্যনালীর গায়ে যে অনৈচ্ছিক পেশী থাকে সেগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতি খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশে খাদ্য নড়াচড়া করে ও জারকরসের সংস্পর্শে এসে জীর্ণ হয় এবং ক্রমশ মলদ্বারের দিকে এগিয়ে যায়।

হৃদ্‌যন্ত্র একটি পাম্প বিশেষ। হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে রক্তবহানালী শিরা ও ধমনী সংযুক্ত। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন এই হৃদ্‌যন্ত্র সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের এই স্পন্দন সাধারণত মিনিটে ৭২ বার হয়। প্রত্যেক সংকোচনের সময় ধমনী ও তাহার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা পথে রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র থেকে দেহের সর্বত্র গিয়ে পৌঁছায়। ছোট ছোট ধমনী থেকে রক্ত জালকের মধ্যে যায়। দেহের সর্বত্র জালক রয়েছে, জালকগুলির আবরণ খুব পাতলা। রক্ত জীর্ণ খাদ্য

ও অক্সিজেন বহন করে জালকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে জালকের পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে এই খাদ্য ও অক্সিজেন দেহের প্রতিটি অংশে যায় এবং ঐ সকল অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ এসে রক্তে মিশে যায়। এই রক্ত অসংখ্য শিরার পথে হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরে আসে। এই দূষিত রক্ত তখন হৃদ্‌যন্ত্র থেকে ফুসফুসে গিয়ে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরে এসে আবার ধমনী পথে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

রক্ত লাল এবং তরল। অসংখ্য কণিকা তরল রক্তে ভেসে বেড়ায়। রক্তের তরল অংশকে রক্তরস বলে। কণিকাগুলি দুইপ্রকার—লোহিত-কণিকা ও শ্বেতকণিকা। এছাড়া অনুচক্রিকা নামে আরও একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা থাকে। লোহিতকণিকার সংখ্যা শ্বেতকণিকার তুলনায় অনেক বেশী। লোহিতকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক এক-প্রকার রঙিন পদার্থ থাকে। এই হিমোগ্লোবিনের জন্যই রক্ত বাতাসের অক্সিজেন সহজে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে।

বক্ষোগহ্বরে যে দুইটি ফুসফুস রয়েছে তার সাহায্যে মানবদেহে শ্বাসকার্য চলে। শ্বাসকার্যের সময় বাইরের বাতাস ফুসফুসের ভিতর টেনে নেওয়া হয়—একে প্রশ্বাস বলে। পরে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যায়—একে বলে নিঃশ্বাস। নাসিকার ছিদ্রপথের সঙ্গে শ্বাস-নালীর এবং শ্বাসনালীর সঙ্গে ফুসফুসের সংযোগ আছে। প্রশ্বাসের সময় বাইরের বাতাস নাসিকার ছিদ্র দিয়ে শ্বাসনালীর পথে ফুসফুসে যায়। ফুসফুসের গায়ে অসংখ্য জালক থাকে। হৃদ্‌যন্ত্র থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসে এসে এই জালকের মধ্য দিয়ে যায়। সেই সময় রক্ত বাইরে থেকে ফুসফুসের ভিতর টেনে নেওয়া বাতাসের অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সহায়তায় গ্রহণ করে এবং কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস ও কিছু জলীয় বাষ্প বাতাসে ছেড়ে দেয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পসহ এই বাতাস নিঃশ্বাসের সময় বেরিয়ে যায়। এইভাবে রক্ত বিশুদ্ধ হয়। অক্সিজেন রক্তের সঙ্গে দেহের সর্বত্র গিয়ে পোঁছায়। দেহের ভিতরে প্রত্যেক অংশে অক্সিজেনের সহযোগে মৃদু দহনকার্য চলে। দহনকার্যের ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প

সৃষ্টি হয় তা বয়ে নিয়ে রক্ত ফুসফুসে যায় এবং নিঃশ্বাসের সময় এগুলি বেরিয়ে যায়। এই দহনকার্যের জন্যই দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

করোটি বা মাথার খুলির ভিতর থাকে মস্তিষ্ক। মানবদেহের সকল রকম অনুভূতি, জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার শক্তির কেন্দ্র এই মস্তিষ্ক। দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলির কাজ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়াও চালিত হয় মস্তিষ্কের সাহায্যে। মেরুদণ্ডের হাড়গুলির ভিতর আগা থেকে শেষ পর্যন্ত সরু সুড়ঙ্গের মতন একটা ফাঁকা জায়গা থাকে। এই ফাঁকা জায়গার ভিতর থাকে সুষুম্না কাণ্ড। মস্তিষ্কের নিচে থেকে বেরিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড বরাবর মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত গিয়েছে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে দেহের দুপাশে জোড়া জোড়া সুতার মত নার্ভ থাকে। এইসব নার্ভ চক্ষু কর্ণ ও নাসিকায়, ত্বকের ইন্দ্রিয়গুলিতে, দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিতে ও পেশীগুলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলিতে যে সব অনুভূতি হয় সেগুলি মস্তিষ্কে পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং মস্তিষ্কে ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে প্রয়োজনমত দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও পেশীগুলি চালনার নির্দেশ নিয়ে যাওয়াই নার্ভগুলির কাজ। অনুভূতি বহনকারী নার্ভগুলিকে সংজ্ঞাবাহী নার্ভ এবং পেশী চালনার নির্দেশ বহনকারী নার্ভগুলিকে চালক নার্ভ বলে। সংজ্ঞাবাহী নার্ভের পথে বাইরের খবর ভিতরে যায় এবং চালক নার্ভের পথে ভিতরের অর্থাৎ মস্তিষ্কের নির্দেশ দেহের বিভিন্ন স্থানের পেশীতে যায়।

দেহের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকাই প্রধান। চক্ষুর সাহায্যে দর্শনের, কর্ণের সাহায্যে শ্রবণের এবং নাসিকার সাহায্যে ঘ্রাণের অনুভূতি হয়। এছাড়া জিহ্বার সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায় এবং ত্বকের সাহায্যে চাপ, স্পর্শ, তাপ, ব্যথা প্রভৃতি অনুভব করা যায়।

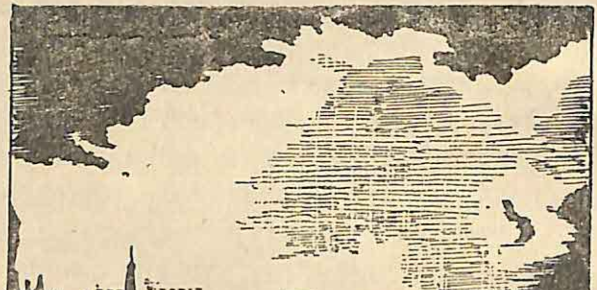
কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও কিছুটা জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এছাড়া উদর গহ্বরে অবস্থিত এক জোড়া বৃক্ক বা 'কিড্নি'র সাহায্যে শরীরের অন্যান্য অবাঞ্ছিত ও দূষিত পদার্থ এবং দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল মূত্ররূপে নিষ্কাশিত হয়। দেহের কতকটা ময়লা জলের সঙ্গে মিশে ঘাম হয়েও বেরিয়ে যায়।

আকাশ পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন প্রকারের মেঘ

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে বিভিন্ন রকমের মেঘ দেখা যায়। সব মেঘেই কিন্তু বৃষ্টি হয় না।

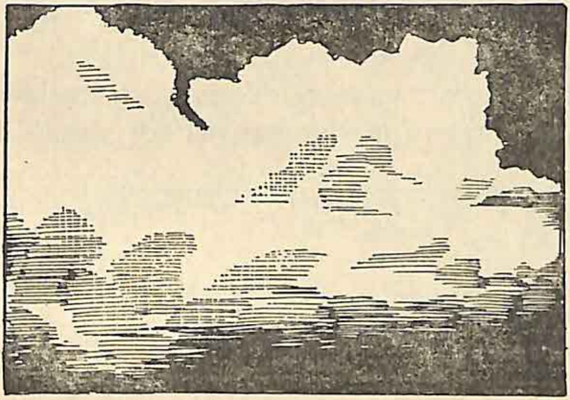
মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল উপরে পালকের মত বা পেঁজা তুলার মত এক রকম ছোট ছোট সাদা মেঘ দেখা যায়। এই মেঘকে **অলক** মেঘ বলে। সাধারণত ভোরবেলা এবং বিকালের দিকেই এই মেঘ দেখতে পাওয়া যায়।



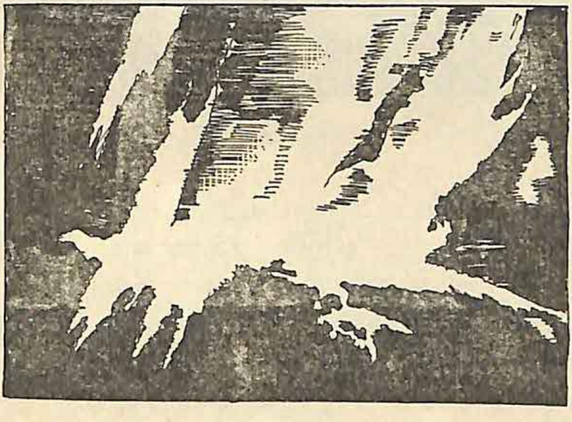
অলক মেঘ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রাশি রাশি তুলার স্তূপের মত যে মেঘ দেখতে পাওয়া যায় তার নাম **স্তূপ** মেঘ। মাটি থেকে প্রায় এক মাইল উঁচুতে এই মেঘ থাকে। সাধারণত সকালের দিকে এই মেঘ দেখা যায় কিন্তু বিকালের দিকে তা মিলিয়ে যায়।

কালবৈশাখীর সময় অথবা বর্ষাকালে আর এক রকম ধূসর বা



স্তূপ মেঘ

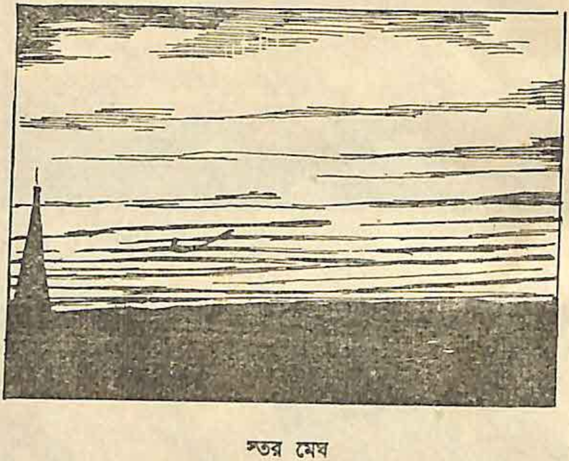


বাদল মেঘ

কালো মেঘ দেখা যায়। এগুলি মাটি থেকে এক থেকে দুই হাজার ফুট

উপরে থাকে এবং আকাশ ছেয়ে ফেলে। এই মেঘ থেকে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। প্রবল বাতাস থাকলে এই মেঘ দ্রুতবেগে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায় এবং এই সময় ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। এই রকম মেঘকে **বাদল মেঘ** বা নীরদ মেঘ বলে।

শরৎকালে আকাশ জুড়ে আর এক রকম যে সাদা মেঘ স্তরে স্তরে সাজান দেখতে পাওয়া যায় তাকে **স্তর মেঘ** বলে। এগুলি প্রায় দুই



স্তর মেঘ

হাজার ফুট উঁচুতে থাকে। সাধারণত রাত্রিকালে এই মেঘ দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যোদয়ের পর এই মেঘের স্তর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

বিভিন্ন ঋতুতে যে নানারকম মেঘ দেখতে পাওয়া যায় তার ছবি খাতায় আঁকবে। মেঘের নাম, প্রকৃতি, সময় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়েছে কিনা তার বিবরণও লিখে রাখবে। ভবিষ্যতে আকাশে মেঘ দেখা দিলে সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে কিনা খাতার ছবি ও বিবরণ মিলিয়ে তা বলা যাবে। এইভাবে নানাপ্রকার মেঘ ও তাদের কাজ জানা হবে।

রাত্রিশেষে ভোরবেলা পূব আকাশ লাল হয়ে ওঠে। এর একটু পরেই সূর্য দেখা দেয়। এই সময় সূর্যকে জবাফুলের মত টকটকে

লাল রঙের একটা বড় থালার মত দেখায়। সূর্য ওঠার পরেই চারিদিক্ আলোয় ভরে যায়। সূর্যের তাপও আমরা অনুভব করতে পারি। শীতের সকালে সূর্যের তাপ পেয়ে আমরা কত আরাম পাই। সূর্য পূব আকাশে ওঠার পর সারাদিন আকাশ পথ অতিক্রম করে এবং বিকালবেলায় পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। মধ্যাহ্নে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে তখন সূর্যের তাপ সবচেয়ে বেশী। বিকালের দিকে আলো এবং তাপের প্রখরতা কমে যায়। সূর্য অস্ত গেলে আলো থাকে না, তাপও আসে না। ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক্ ঢেকে যায়।

শিশির

সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্র, নদনদী, পুকুর প্রভৃতি জায়গায় জল বাষ্পে পরিণত হয়। এই জলীয় বাষ্প বাতাসে মিশে যায়। এইজন্য সকল সময়েই বাতাসে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে। গরম বাতাস যতটা জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে ঠাণ্ডা বাতাস ততটা পারে না। জলীয় বাষ্পসহ গরম বাতাস যখন কোন ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে আসে তখন জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। এই-জন্যই বরফজল ভরতি একটা গেলাসের গায়ে জলবিন্দু জমা হতে দেখা যায়।

হেমন্ত ও শীতকালে ভোরবেলায় ঘাস ও গাছের পাতার উপর যে জলবিন্দু দেখা যায় তাকেই শিশির বলে। দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তাপে মাটি, পাথর, ঘাস, গাছপালা ইত্যাদি গরম হয়ে যায়। রাত্রিকালে তাপের অভাবে এগুলি ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে থাকে। গাছপালা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাটি কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় না। রাত্রে জলীয় বাষ্পসমেত গরম বাতাস এইসব ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে এলে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। এই জল-কণাকেই শিশিররূপে দেখি। যে জিনিস যত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় তার উপর তত বেশী শিশির জমে।

মেঘ ও বৃষ্টি

জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা। যে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত বেশী সে বাতাস তত বেশী হালকা। এই হালকা বাতাস ক্রমশ উপরে উঠে যায়। গরম বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী। সেজন্য এই বাতাস হালকা এবং সহজেই উপরে উঠে যায়। বাতাস যত উপরে ওঠে বাতাসের তাপ তত কমে যায়। এছাড়া উপরে বাতাসের চাপ কমে যায় বলে বাতাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং আরও ঠাণ্ডা হয়। বাতাস ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এগুলি সাধারণত বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধুলার কণা আশ্রয় করে ভেসে বেড়ায়। এই রকমে অসংখ্য জলকণার সৃষ্টি হয়। এগুলি আকারে এত ছোট যে এরা সহজে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। আকাশে ভাসমান এই অসংখ্য জলকণাই মেঘের সৃষ্টি করে। এই জলকণাগুলি যখন আরও উপরে ওঠে তখন আরও বেশী ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে এগুলি ক্রমশ বড় হয় এবং ভারী হয়ে পড়ে। তখন আর এগুলি বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না। জলবিন্দুগুলি তখন বড় বড় ফোঁটার আকারে মাটিতে পড়ে। একেই বৃষ্টি বলে।

জ্যোতিষ্ক

দিনের বেলায় আকাশে একমাত্র সূর্যকেই দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু রাত্রিতে আকাশে চন্দ্র এবং অসংখ্য আলোকবিন্দু আমাদের চোখে পড়ে। সূর্য, চন্দ্র এবং এইসব আলোকবিন্দুকে সাধারণভাবে জ্যোতিষ্ক বলে। দিনের বেলায় সূর্যের উজ্জ্বল ও তীব্র আলোকে চন্দ্র এবং অন্যান্য আলোকবিন্দু আমাদের চোখে পড়ে না। রাত্রির আকাশে চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য যে সব আলোকবিন্দু দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশই নক্ষত্র; অল্প কয়েকটি আছে যেগুলিকে গ্রহ বলে। নক্ষত্রগুলি আকাশে স্থির থাকে, পরস্পরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে না। কিন্তু গ্রহগুলি

নক্ষত্রের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে সেইজন্য আকাশে সেগুলিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে যেতে দেখা যায়। গ্রহের চারিদিকে ঘোরে উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তাই চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ।

চন্দ্র বা গ্রহগুলির নিজস্ব কোন আলোক নেই। সূর্যের আলোক এগুলিকে আলোকিত করে। সেই আলোক আমাদের চোখে আসে বলে এগুলিকে আমরা দেখতে পাই। গ্রহগুলির আলোক স্থির এবং উজ্জ্বল। নক্ষত্রগুলি সূর্যের মতই বড় তবে পৃথিবী থেকে সূর্য যত দূরে আছে তার বহু বহু গুণ দূরে আছে বলে এগুলিকে এত ছোট দেখায়। নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে। এগুলি সব সময় মিটমিট করে জ্বলে। নক্ষত্রের আলো ম্লান, উজ্জ্বল নয়।

সূর্য

আমাদের কাছে সূর্যই সব চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সূর্যই আলোর প্রধান উৎস। সকালবেলা পূব আকাশে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক্ আলোয় ভরে যায়। সারাদিন আলো দিয়ে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যায় তখন রাত্রি নামে, আর চারিদিক্ অন্ধকার হয়ে যায়। আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির আছে আর সূর্য সমস্ত দিন ধরে আকাশ পরিক্রমা করে পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে। আসলে পৃথিবীই লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম থেকে পূবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। গোলাকার পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরার জন্যই মনে হয় সূর্য আকাশে পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে। পৃথিবীর একবার লাট্টুর মত ঘুরতে অর্থাৎ পাক খেতে লাগে ২৪ ঘণ্টা। ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। এই ঘোরার সময় যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে সেই অংশে হয় দিন আর যেখানে সূর্যের আলো পড়ছে না সেখানে হয় রাত্রি। যে অংশে রাত্রি হয় সেই অংশ ঘুরে যখন আবার সূর্যের আলোয় এসে পড়ে তখন সেখানে আবার দিন হয়। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে

প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। ইহাকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে।

সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে তাই তাকে ছোট দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সূর্য একটা গ্যাসের জ্বলন্ত পিণ্ড। আকাশে সূর্য জ্বলছে—এইজন্যই সূর্যের কাছ থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই। সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আছে তাই সূর্যের তাপের সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পেঁছায় এবং এই তাপ আমরা সহ্য করতে পারি।

সূর্যের কাজ ঃ সূর্য তাপ ও আলোকের উৎস। সূর্য আছে তাই আমরা তাপ ও আলো পাই। সূর্য না থাকলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে যেত এবং সব সময় অন্ধকারে ঢাকা থাকত। সূর্যের আলোকেই চন্দ্র ও গ্রহগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের তাপের জন্য বাতাস চলাচল করে ও ঋতু পরিবর্তন হয়। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে জলাশয়গুলি ভরে যায়, মাটি সরস হয়ে চাষ আবাদের সুবিধা হয়।

সূর্য সকল শক্তির উৎস। সূর্য-কিরণের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ্ নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীরা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। সূর্য না থাকলে উদ্ভিদ্ বা প্রাণী বেঁচে থাকতে পারত না।

সূর্যের আলো নানাপ্রকার রোগজীবাণু ধ্বংস করে। প্রচুর সূর্যের আলো এবং তাপ পেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নানারকম রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর জীবনধারণের জন্য সূর্যের আলো এবং তাপ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সূর্যের আকর্ষণের ফলে গ্রহ উপগ্রহগুলি তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘুরছে।

চন্দ্র

চন্দ্রই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে চন্দ্রও সেই রকম লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষ-

পথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরতে চন্দ্রের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩½ মিঃ। এইরূপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় চন্দ্রের একটা দিক্‌ই সব সময় পৃথিবীর দিকে থাকে। এই দিক্‌টাই আমরা দেখতে পাই। চন্দ্রের উল্টোদিক্ আমরা কখনও দেখতে পাই না। অন্যান্য জ্যোতিষ্কের তুলনায় চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে আছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র দুই লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার মাইল। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র আকারে অনেক ছোট। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। আকাশের গায়ে সূর্য অবিরাম জ্বলছে এবং চারিদিকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই আলো চন্দ্রের উপর এসে চন্দ্রকে আলোকিত করে। চন্দ্র থেকে এই আলো আমাদের চোখে আসে তাই আমরা চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখি। এই উজ্জ্বল চন্দ্র থেকে যে আলো পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তাকেই চন্দ্রের আলো বা জ্যোৎস্না বলে। চন্দ্র থেকে কোন তাপও আমরা পাই না। চন্দ্রের আলো ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ।

চন্দ্রের গায়ে কালো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। দূরবীন দিয়ে দেখলে চন্দ্রের উপরতল উঁচু নিচু দেখায়। উপরটা ছোট বড় পাহাড় ও গর্তে ভরা। এই সব গর্তে সূর্যের আলো পৌঁছায় না তাই সেগুলিকে কালো দাগের মত দেখায়। এইগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলে।

চন্দ্রের কলা ঃ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে আর পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে চন্দ্র। এইরকম ঘোরার সময় চন্দ্রের যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সেই অংশই সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়—অপরদিক্ থাকে অন্ধকার। পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে যখন চন্দ্র থাকে তখন চন্দ্রের সম্পূর্ণ আলোকিত অংশটুকু আমরা দেখতে পাই। এই সময়কেই পূর্ণিমা বলে। পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রকে সম্পূর্ণ গোলাকার দেখায়। পূর্ণিমার পর পনর দিন ধরে আলোকিত অংশের যেটুকু আমরা দেখতে পাই তা ক্রমশ কম হতে হতে কাস্তের মত সরু হয়ে যায়। এই পনর দিনে চন্দ্র নিজের কক্ষপথে চলতে চলতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে। এই সময়কে অমাবস্যা বলে।

অমাবস্যার রাত্রে আকাশের যে অংশ আমরা দেখতে পাই সেই অংশে চন্দ্র থাকে না, থাকে অন্য অংশে যে দিকে সূর্য রয়েছে, যে দিকে তখন দিন। তাই অমাবস্যায় রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখতে পাই না। অমাবস্যার পরে প্রথমে চন্দ্রের আলোকিত অংশকে পশ্চিম আকাশে দিগন্তের কাছে সরু কাস্তের মত দেখা যায়। পরের পনর দিন ধরে চন্দ্র তার পথে চলতে চলতে আবার পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে পেঁছায়। এই সময়ে চন্দ্রের আলোকিত অংশ যা আমরা দেখতে পাই ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্র আবার সম্পূর্ণ গোলাকার দেখায়। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের আলোকিত অংশ যেটুকু দেখা যায় তা শুক্লপক্ষে অর্থাৎ অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ক্রমশ বাড়ে এবং কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ক্রমশ কমে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের আলোকিত অংশের যেটুকু আমরা দেখতে পাই তাকেই চন্দ্রের কলা বলে। এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় লাগে সাড়ে ঊনত্রিশ দিন।

চন্দ্রের কাজ ঃ রাত্রিকালে সূর্যের আলো আমরা পাই না। এই সময়ে আকাশে চন্দ্র থাকলে চন্দ্রের আলো পাই। রাত্রে চন্দ্রের আলো থাকলে আমাদের কাজকর্মের অনেক সুবিধা হয়। চন্দ্রের আলো না থাকলে প্রতি রাত্রিতে অমাবস্যার মত ঘন অন্ধকার হত।

সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে তবে চন্দ্র পৃথিবীর অনেক কাছে তাই তার আকর্ষণ প্রবল। চন্দ্রের এই আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। চন্দ্রের ও সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে ওঠে। এই জল বেগে নদীতে প্রবেশ করে। একেই বলে জোয়ার। জোয়ারের সময় নদীর জল বেড়ে যায়। আকর্ষণ কমে গেলে নদীর জল আবার সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। একেই বলে ভাঁটা। এই সময় নদীতে বাড়তি যে জল প্রবেশ করেছিল তা বেরিয়ে যায়। অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র একই দিকে থাকে বলে এই আকর্ষণ প্রবল হয়, কাজেই তখন জোয়ারের মাত্রা বেশী হয়। জোয়ার ভাঁটার জন্য নদীখাত গভীর থাকে বলে নদীপথে জলযানের যাতায়াত সহজ হয়, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

রাত্রির আকাশ

দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চারিদিক্ অন্ধকার হয়ে যায়—রাত্রি আরম্ভ হয়। এই সময় আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়। পৃথিবীর চারিদিকেই আকাশ এবং এই আকাশের সর্বত্রই নক্ষত্র রয়েছে। রাত্রে আকাশের অর্ধেকটা আমরা দেখতে পাই। অন্য অর্ধেক থাকে অপরদিকে তাই আমরা দেখতে পাই না। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের ফলে এই অপর অর্ধেক অংশ দিনের বেলা আমাদের সামনে আসে। দিনের বেলায় সূর্যের উজ্জ্বল আলো থাকে সেজন্য এসময় নক্ষত্রগুলিকে দেখা যায় না। রাত্রিকালে যদি চন্দ্রের আলো থাকে তা হলেও এগুলিকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় না। অন্ধকার রাত্রিতেই আকাশের গ্রহ ও নক্ষত্রগুলিকে ছোট ছোট আলোক বিন্দুর মত দেখায়। বার্ষিক গতিতে পৃথিবীর পরিক্রমার সময় আকাশের সম্পূর্ণ অংশটাই সারা বৎসরে ক্রমে ক্রমে রাত্রিবেলা আমাদের সামনে আসে এবং সমস্ত আকাশটার নক্ষত্র-গুলিই আমরা দেখতে পাই। এই বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী ছয় মাসে সূর্যের একদিক্ থেকে অন্যদিকে যায়। তখন ছয় মাস পূর্বে দিনের বেলায় আকাশের যে অংশ আমরা দেখতে পেতাম সেই অংশের সবটাই রাত্রিকালে আমাদের সামনে আসে। আগেকার নক্ষত্রগুলি তখন আর দেখা যায় না, আকাশের এই অংশে অবস্থিত নূতন নূতন নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। এক বৎসর পরে প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করে পৃথিবী যখন পূর্বেকার স্থানে এসে পেঁছায় তখন আগেকার দেখা রাত্রির আকাশ আবার আমাদের সামনে আসে এবং আকাশের সেই অংশের নক্ষত্রগুলি আবার আমরা দেখতে পাই।

নক্ষত্রগুলির অনেকেই আকারে সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড়। পৃথিবীর কাছ থেকে এরা বহু বহু দূরে রয়েছে তাই এদের এত ছোট দেখায়। প্রত্যেকটি নক্ষত্র সূর্যের মত জ্বলছে তাই এদের নিজস্ব আলোও আছে। এইজন্য এদের মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়।

অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র ছাড়া আরও কতকগুলি উজ্জ্বল আলোক-বিন্দু দেখা যায়। এগুলির আলো স্থির, মিটমিট করে না। এরা

সূর্যের গ্রহ। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো গ্রহগুলির উপর পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। সেই আলো আমাদের চোখে পড়লে আমরা তাদের দেখতে পাই। গ্রহগুলি তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এই ঘোরার সময় তাদের কতকগুলি রাত্রিবেলা আকাশের গায়ে দেখা যায়, অন্যগুলি পৃথিবীর অপর দিকের আকাশে থাকে বলে আমরা তাদের দেখতে পাই না।

সন্ধ্যাতারা ঃ সন্ধ্যার পরেই পশ্চিম আকাশে দিগন্তের খুব কাছেই একটি অতি উজ্জ্বল বড় তারা দেখতে পাওয়া যায়। একেই বলে সন্ধ্যাতারা। এটি কিন্তু নক্ষত্র নয়। এটি একটি গ্রহ। অন্যান্য সব গ্রহের তুলনায় এই গ্রহটি পৃথিবীর খুব নিকটে রয়েছে এবং অন্যান্য গ্রহের মত এটিও সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এইজন্য সন্ধ্যাতারা আকাশের গায়ে এক জায়গায় স্থির থাকে না। কিছুদিন ধরে একে সন্ধ্যাতারারূপে দেখার পর সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে একে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এসময় কিছুদিন ধরে এটি সূর্যোদয়ের কিছু আগে পূব আকাশে দেখা দেয়। তখন একে শুকতারা বলে। সন্ধ্যাতারার আলোক স্থির ও অতি উজ্জ্বল। এই সন্ধ্যা বা শুকতারাই শুক্রগ্রহ (Venus)।

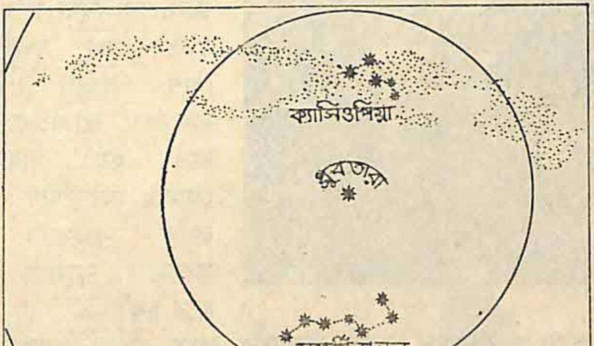
অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জায়গায় জায়গায় কতকগুলি নক্ষত্র একত্রে দল বেঁধে রয়েছে। এই রকম এক একটি দলকে নক্ষত্রমণ্ডল বলে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ এক একটি দলের নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে নানারকম জীবজন্তু বা মূর্তির আকার কল্পনা করে গেছেন। সেই অনুসারে এই সব নক্ষত্রমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হয়েছে।

সপ্তর্ষি মণ্ডল ঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকে প্রায় ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত উত্তর দিকের আকাশে সাতটি নক্ষত্রের একটি মণ্ডল দেখা যায়। কাল্পনিক রেখা দিয়ে এদের যোগ করলে অনেকটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের (?) মত বা লাঙলের মত দেখায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলের নাম সপ্তর্ষি মণ্ডল। সাতজন ঋষির নামে নক্ষত্র সাতটি পরিচিত।

ধ্রুবতারা ঃ সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রথম দুটি নক্ষত্র একটি কাল্পনিক

রেখা দিয়ে যোগ করে রেখাটি আরও বাড়িয়ে দিলে এই রেখাটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের খুব কাছে গিয়ে পোঁছায়। এই নক্ষত্রটির নাম ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা পৃথিবীর উত্তর মেরুর ঠিক উপরে বরাবর আকাশের একই জায়গায় থাকে। পৃথিবী যখন নিজে পশ্চিম থেকে পূবে পাক খায় তখন মনে হয় আকাশের নক্ষত্রগুলি পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। কিন্তু ধ্রুবতারা সব সময় একই স্থানে স্থির হয়ে থাকে। ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে অন্ধকার রাত্রে দিক্ ঠিক করতে পারা যায়। পূর্বে সমুদ্রপথে নাবিকেরা এই নক্ষত্র দেখে দিক্ নির্ণয় করত।

ক্যাসিওপিয়া ঃ ধ্রুবতারার যে দিকে সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখা যায় তার বিপরীত দিকে ক্যাসিওপিয়া নামে আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে



পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলে পাঁচটি নক্ষত্র রয়েছে। একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে এই নক্ষত্রগুলিকে যোগ করলে ইংরেজী অক্ষর W বা M -এর মত দেখায়। এই অক্ষরের খোলা দিক্‌টা ধ্রুবতারার দিকে থাকে। উত্তর আকাশে ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে একদিকে সপ্তর্ষি মণ্ডল ও তার বিপরীত দিকে ক্যাসিওপিয়া রয়েছে। সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি ধরে সপ্তর্ষি মণ্ডল ও ক্যাসিওপিয়া ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে পূব থেকে

পশ্চিমে ঘড়ির কাঁটার পথের উল্টোদিকে ঘুরছে বলে মনে হয়। পৃথিবী প্রতিদিন পশ্চিম থেকে পূবে পাক খায় বলেই এইরূপ মনে হয়। এইরূপে আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থান পরিবর্তিত দেখালেও তার প্রথম দুটি তারা একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে বাড়িয়ে দিলে এই রেখা সব সময়েই ধ্রুবতারার কাছে গিয়ে পেঁছায়।

কালপুরুষ ঃ মাঘ-ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যার পর আকাশের দক্ষিণ অংশে একটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলটির নাম কাল-পুরুষ। মাঘ মাসে কালপুরুষ সন্ধ্যায় দেখা যায় দক্ষিণ-পূব আকাশে, ক্রমে বৈশাখ মাসে একে সন্ধ্যায় দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। কাল্পনিক রেখা দিয়ে এই নক্ষত্রমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি যোগ করলে একটি মানুষের আকারের মত মনে হয়। মানুষটির কোমরে কোমরবন্ধ ও তা থেকে একখানা ছোট তলোয়ার ঝুলছে বলে মনে হয়।



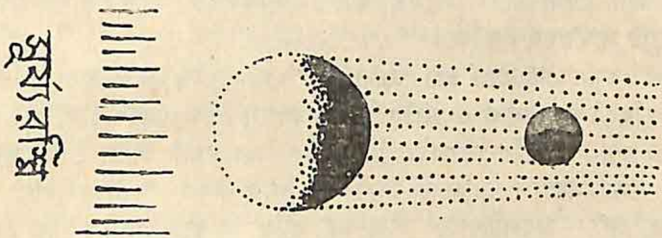
ছায়াপথ ঃ অন্ধকার রাত্রে আকাশের গায়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা পথের মত আলোর পথ দেখতে পাওয়া যায়। একেই বলে ছায়াপথ। অসংখ্য নক্ষত্র মিলে ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছে। নক্ষত্রগুলি বহুদূরে রয়েছে বলে তাদের পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেখা যায় না। যে অংশে এই নক্ষত্রগুলি রয়েছে সেই অংশটি ঈষৎ আলোকিত দেখা যায়। ছায়াপথের আলো কম বলে ঘন অন্ধকার রাত্রি ছাড়া ছায়াপথ পরিষ্কার দেখা যায় না।

সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্রহ নক্ষত্রগুলি চিনতে চেষ্টা করবে। তোমাদের জানা নক্ষত্রমণ্ডলগুলি কোন্ সময়

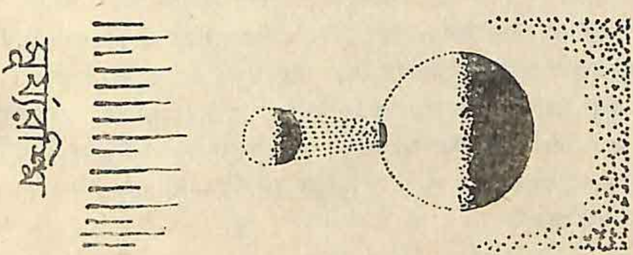
কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তা লক্ষ্য করবে। আকাশের নকশা তৈরি করে সেই নকশায় তোমাদের জানা গ্রহনক্ষত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ করবে। প্রতি মাসের জন্য একটা নকশা করতে পারলে ভাল হয়।

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, আর পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র তার নিজের কক্ষপথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে।



চন্দ্রগ্রহণ



সূর্যগ্রহণ

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে তখন হয় অমাবস্যা। আর চন্দ্র যখন পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে যায় তখন হয় পূর্ণিমা।

আলো সব সময় সোজা পথে চলে। আলোর পথে একটা অস্বচ্ছ জিনিস ধরলে সেই জিনিসের ছায়া পড়ে। অমাবস্যায় চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে এসে উপস্থিত হয় অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন একদিকে এক সরলরেখায় আসে তখন সূর্যের আলো চন্দ্রে বাধা পায়, চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করে রাখে। পৃথিবীর কতক অংশ থেকে সূর্যকে তখন আর দেখা যায় না। পৃথিবীর যে অংশ থেকে সূর্যকে দেখা যায় না সেখানে হয় সূর্যগ্রহণ। পৃথিবী ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ-পথে এগিয়ে চলেছে। ফলে কিছুক্ষণ পরেই বাধা সরে যায়, সূর্যকে আবার দেখা যায়। সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে দিনের বেলায়, তাই সূর্যগ্রহণ হয় দিনে।

পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্র আলোকিত হয় সূর্যের আলোয়। পূর্ণিমায় পৃথিবী যখন সূর্য ও চন্দ্রের ঠিক মাঝখানে এসে পড়ে অর্থাৎ যখন সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর বিপরীত দিকে এক সরলরেখায় আসে তখন সূর্যের আলো সোজা গিয়ে চন্দ্রে পেঁছাতে পারে না। পথে বাধা সৃষ্টি করে পৃথিবী। আলোর পথে বাধা এই পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রের উপর। একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রের আলোকিত অংশ কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা পড়ে যায়। অবশ্য পরে ছায়ামুক্ত হয়ে চন্দ্র আবার দেখা দেয়।

সূর্য বা চন্দ্র যখন সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে তখন হয় পূর্ণগ্রাস গ্রহণ আর যখন আংশিকভাবে ঢাকা পড়ে তখন হয় খণ্ডগ্রাস গ্রহণ।

সব অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না আবার সব পূর্ণিমাতেও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এর কারণ সব অমাবস্যায় বা পূর্ণিমাতে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরলরেখায় এসে পড়ে না। এই তিনটি এক সরলরেখায় না এলে গ্রহণ হয় না।

বিভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া

তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে বৎসরের কোন সময় বেশ গরম আবার কোন সময় বেশ ঠাণ্ডা, কখনও বা আকাশ পরিষ্কার আবার কখনও বা মেঘাচ্ছন্ন, কখনও বায়ুপ্রবাহ প্রবল কখনও আবার মনে হয় বায়ু

চলাচল একেবারেই নেই, কখনও হয় বৃষ্টিপাত আবার কখনও দিনগুলি বৃষ্টিহীন শুষ্ক। কোন জায়গায় যে কোন একদিনে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা কত, বায়ুর চাপের পরিমাণ কত, বৃষ্টিপাত কতটা হয়েছে, বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপ, বায়ুর প্রবাহ কেমন, আকাশ পরিষ্কার না মেঘাচ্ছন্ন প্রভৃতি অবস্থাকে সেই দিনের আবহাওয়া বলে। প্রতিদিন আবহাওয়া ঠিক একরকম থাকে না, কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। আবার বৎসরের একসময়ে যে আবহাওয়া থাকে অন্য সময় তা একেবারে বদলে যায়। পৃথক্ পৃথক্ আবহাওয়ার জন্য বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়কে এক একটি ঋতু বলে। আমাদের দেশে ছয়টি ঋতুঃ গ্রীষ্ম (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস), বর্ষা (আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস), শরৎ (ভাদ্র ও আশ্বিন মাস), হেমন্ত (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস), শীত (পৌষ ও মাঘ মাস) এবং বসন্ত (ফাল্গুন ও চৈত্র মাস)। এক ঋতুতে যে আবহাওয়া থাকে পরের ঋতুতে তা বদলে যায়।

গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রখর সূর্যকিরণে ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, প্রবল বেগে বায়ু চলাচল করে, অনেক সময় কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দেয়। কখনও কখনও বজ্র-বিদ্যুৎসহ দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়। এর পরের দুই মাস বর্ষাঋতু। এই সময়ে আকাশ প্রায় সব সময়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, মাঝে মাঝে মেঘগর্জনও শোনা যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত খুব বেশী, অনেক সময় সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে বলে অধিকাংশ সময় সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই সময় বায়ুর গতির পরিবর্তন হয় ও বায়ুর উষ্ণতা কমে যায়। বর্ষার পরে আসে শরৎ ঋতু। এই সময় নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের দল ঘুরে বেড়ায়। শরৎকালে বৃষ্টিপাত অনেক কমে যায়, সোনালী রোদে চারিদিক্ ঝলমল করে। এরপর আসে হেমন্ত ঋতু। এই সময় আকাশ নীল এবং প্রায়ই পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত থাকে। রাত্রির দিকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। রাত্রে শিশির পড়ে, সকালে গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুগুলি সূর্যকিরণে চকচক করে। এই সময়ে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। হেমন্তের পর আসে শীত ঋতু। শীত ঋতুতে বায়ুর উষ্ণতা খুব কমে যায় বলে শীত

অনুভব করতে হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও খুব কম থাকে। এই সময় সাধারণত আকাশে মেঘ থাকে না এবং গাছপালার পাতা প্রায়ই শুকিয়ে ঝরে পড়ে। উত্তর দিক্ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস দক্ষিণ দিকে আসে। এর পর আসে বসন্ত ঋতু। এই সময় বায়ুর উষ্ণতা ক্রমে বাড়তে থাকে, এবং দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত হয়। গাছে গাছে দেখা যায় পত্র পুষ্পের সমারোহ। শীতের পর বসন্তে প্রকৃতির সুন্দর রূপ ও শোভা আবার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন ঋতুতে প্রতিদিনের আবহাওয়া তোমরা যদি একটা খাতায় লিখে রাখ তাহলে কোন্দিন কি রকম আবহাওয়াছিল সে সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারবে এবং এই খাতা দেখে কোন একদিনের আবহাওয়ার একটা অনুমান করতে পারবে। সাধারণতঃ খবরের কাগজে এবং রেডিও মারফত প্রতিদিন আবহাওয়ার সংবাদ ও পূর্বাভাস প্রচার করা হয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঝড়বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়। এর ফলে সতর্ক হওয়ার জন্য অনেক সময় দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ান সম্ভব হয়।

আবহাওয়ার চিত্র কি করে প্রস্তুত করতে হয় তোমরা জান। রৌদ্র, বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের জন্য এক একটি চিহ্ন বা প্রতীক ঠিক করে নিতে হবে। এইসব প্রতীকের সাহায্যে প্রতিদিনের আবহাওয়াচিত্র লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই চিত্র থেকে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া কিরূপ অতি সহজেই তা জানা যাবে। বিশেষ করে যারা শিক্ষিত নয় প্রতীক জানা থাকলে তারাও সহজে বিষয়গুলি বুঝতে পারবে।

মাটি ও সার

মাটি

ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তর কোথাও কঠিন আবার কোথাও নরম। কঠিন স্তরে রয়েছে পাথর বা শিলা। যে স্তর নরম তাকেই মাটি বলে। সাধারণত এই মাটিতেই গাছপালা জন্মায়। হাজার হাজার বৎসর ধরে সূর্যের প্রখর তাপ, বৃষ্টি, জলের প্রবাহ প্রভৃতি নানা কারণে কঠিন পাথর খন্ড খন্ড হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো ও বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। মাটির প্রধান উপাদান এই বিকৃত শিলাচূর্ণ বা পাথরের গুঁড়া। এই পাথরের চূর্ণের সঙ্গে মিশে যায় জীবজন্তু ও গাছপালার গলিত অংশ, কিছু পরিমাণ জল ও বায়ু এবং অনেক সময় নানাপ্রকার জীবাণু। এইভাবে পৃথিবীর বুকে মাটির উৎপত্তি হচ্ছে। মাটির কণাগুলি তৈরী হওয়ার পর কখনও কখনও ঐ স্থানেই থেকে যায়। এই মাটির স্তর বিশেষ গভীর হয় না। এই স্তরের নিচেই পরিবর্তনশীল পাথরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার স্তর দেখতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরে এই রকম মাটির স্তর দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণ বৃষ্টির জলে, নদীর স্রোতে অথবা বায়ু প্রবাহের দ্বারা উৎপত্তিস্থান থেকে সরে অন্য এক জায়গায় জমা হয়। নদীর চরের বা জলা জায়গায় নূতন জমির উৎপত্তি এইভাবেই হয়।

মাটি প্রধানত দুই রকমের হয়—বেলে মাটি ও এঁটেল মাটি।

বেলে মাটি ঃ এতে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বালি এবং ১০ ভাগ কাদা থাকে। নদীর চরের মাটি প্রায়ই এই রকম। এই মাটি প্রচুর জলশোষণ করে কিন্তু এই মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশী এবং কাদার ভাগ কম থাকায় জল ধরে রাখতে পারে না। এই মাটিতে পটল, শসা, তরমুজ প্রভৃতি ফসল ভাল হয়।

এঁটেল মাটি ঃ এতে শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ কাদা ও অন্যান্য পদার্থ, ১০-২০ ভাগ বালি এবং বাকী অংশ জল। এই মাটির জল-

ধারণের ক্ষমতা খুব বেশী কিন্তু বায়ু এই মাটিতে প্রবেশ করতে পারে না বলে বায়ুর অভাব হয়। সাধারণত চাষের পক্ষে এই মাটি উপযোগী নয়। যথেষ্ট সার মিশিয়ে মাটি আলগা করে নিলে চাষের উপযোগী হয়। এই মাটির উপর পলিমাটির (বন্যার জলের বেলে মাটি) স্তর জমলে ধান ও যবের চাষ ভাল হয়।

বেলে মাটি ও এ'টেল মাটির সংমিশ্রণে হয় দো-আঁশ মাটি। এই মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ প্রায় সমান থাকে। দো-আঁশ মাটি খুব উর্বর এবং কৃষিকার্যের উপযোগী। এই মাটিতে চাষ করা সহজ। এই মাটি প্রচুর জল শোষণ করে এবং তা ধরে রাখতে পারে। এই মাটিতে ধান, ভুট্টা, সরষে, তামাক প্রভৃতি সকল রকম ফসল খুব ভাল হয়।

সার

গাছ মাটি থেকে খাদ্যদ্রব্যের উপাদান সংগ্রহ করে। ফসল উৎপাদনের ফলে মাটির ভিতরে সঞ্চিত উদ্ভিদের খাদ্য ক্রমশ কমে যায়, ফলে মাটির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়। এই জমিতে তখন আর আগের মতন ভাল ফসল হয় না। একই জমিতে বার বার ভাল ফসল পেতে হলে এই খাদ্যের অভাব পূরণ করা দরকার। যে সকল পদার্থ যোগান দিয়ে মাটির ভিতর উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব পূরণ করা যায় এবং মাটির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় বা আরও বৃদ্ধি করা যায় তাকেই সার বলে। উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য জলে দ্রব অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে সেইজন্য সারের উপাদান এমন হওয়া উচিত যাতে সেগুলি সহজে জলে দ্রব হয়। সারের অভাবে ফসলের উৎপাদন কম হয়, আবার সারের পরিমাণ বেশী হলে উদ্ভিদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

গোময় বা গোবর জমির সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গোবর সহজেই যোগাড় হয় তবে এই সার পরিমাণে বেশী দিতে হয়। কোন চৌবাচ্চায় বা বন্ধ জায়গায় গোবর জমা করে গোবর সার তৈরি করতে হয়। বীজ ছড়াবার আগে জমিতে এই সার দিয়ে লাঙ্গল দিতে হয়।

এর ফলে মাটির সঙ্গে সার ভালভাবে মিশে গিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

গোমূত্র গোবরের চেয়ে ভাল সার। গোমূত্র ২০ গুণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এতে জমির উর্বরতা বাড়ে।

গোময় এবং গোমূত্র ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু এমনকি মানুষের মল-মূত্রও উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মানুষের মল আমাদের দেশে সাধারণত ব্যবহার হয় না। বড় গর্তের ভিতর মানুষের মল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। এতে দুর্গন্ধ দূর হয়। এই অবস্থায় একে সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘোড়া, ছাগল বা মহিষের বিষ্ঠা সার হিসাবে গোময় অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী, তবে এগুলি বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করা সহজ নয়।

পাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য সবুজ অংশ পচিয়ে নিয়ে খুব ভাল সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একটি বড় গর্তে এগুলি জমা করে রাখতে হয়। এই সঙ্গে গোময়, গোমূত্রও মিশিয়ে দেওয়া চলে। অনেক দিন এইভাবে রাখলে এর মধ্যে অসংখ্য জীবাণু জন্মায় এবং এরাই এইসব আবর্জনাকে সারে পরিণত করে। ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে এই সার ব্যবহার করা খুব ভাল।

ধঞ্চে, মটর প্রভৃতি গাছ বাতাস থেকে প্রচুর নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। চাষের সাহায্যে এইসব গাছ তৈরি করে সবুজ অবস্থাতেই এদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই সারকে সবুজ সার বলে।

আজকাল নানারকম রাসায়নিক সারের সাহায্যে মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা আছে এবং এর জন্য আমাদের দেশে সার উৎপাদনের কারখানাও স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

জমিতে সার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত জলসেচের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

মাটির ক্ষয় ঃ মাটির উপরের স্তর নষ্ট হয়ে যাওয়াকে মাটির ক্ষয় বলে। অতিবৃষ্টির ফলে অথবা বন্যায় যে সকল জমি জলে ডুবে যায়

সেই সকল জায়গার মাটির উপরের স্তরের সারাংশ জলে ধুয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং জলের স্রোতের সঙ্গে বহুদূরে চলে যায়। এইরূপে মাটির ক্ষতি হয়, মাটির উর্বরতা কমে যায়। জমির চারিদিকে আল বেঁধে জল ধরে রাখার বন্দোবস্ত করলে এই ক্ষতি কিছুটা বন্ধ করা যায়।

কোন জমিতে প্রতি বৎসর একই ফসল উৎপাদন করলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ কমে গিয়ে জমি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ করলে এই অবস্থা রোধ করা সম্ভব। এতে মাটির উপাদানগুলি পরিমিত ব্যয় হয় বলে উর্বরতা শীঘ্র কমে যায় না। মাঝে মাঝে জমি চাষ না করে পতিত রেখে দিলেও জমির উর্বরতা রক্ষা করা যায়।

উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে। যেখানে গাছপালা আছে সেখানকার মাটি শিকড় থাকার জন্য আলগা হয়ে যায় না। এজন্য বৃষ্টির জলে সহজে মাটির কোন ক্ষয় হয় না। যেখানে গাছপালার অভাব সেখানকার মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির জল সহজেই এই মাটির ক্ষতিসাধন করে। আলগা মাটি জলের সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে যায়। নূতন গাছপালা রোপণ করে মাটির এই রকম ক্ষয় বন্ধ করা যায়।

কৃষিক্ষেত্র ও পুষ্করিণী পর্যবেক্ষণ

ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব জমিতে চাষ করা হয় সেইগুলি কৃষিক্ষেত্র। জীবনধারণের জন্য আমাদের নানারকম কৃষিজাত ফসলের উপর নির্ভর করতে হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য যে কত যত্ন ও পরিশ্রম দরকার মাঝে মাঝে কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলে তা বেশ বোঝা যায়।

ভাল ফসল পেতে হলে জমি ভাল করে চাষ করা দরকার। দুই-এক পশলা বৃষ্টির পরেই জমির মাটি আলগা করে নিতে হয়। সাধারণত লাঙ্গলের সাহায্যে এই কাজ করা হয়। কৃষিক্ষেত্র ছোট হলে এই কাজ কোদাল দিয়েই চলে। বার বার লাঙ্গল দেওয়ার ফলে খেতের মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যায়। এর ফলে মাটি যথেষ্ট রৌদ্র ও বাতাস পায়। এই

রকম মাটিতে গাছের শিকড়গুলি সহজে প্রবেশ করতে পারে বলে গাছের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা সহজ হয়। চাষের সময় জমিতে প্রয়োজনমত সারও দেওয়া হয়। জমিতে লাগল দেওয়ার পর মই-এর সাহায্যে জমির মাটি সমান করে নেওয়া হয়। মাটি উঁচু নিচু বা অসমান থাকলে বীজ সমানভাবে পড়ে না। অসমান জমিতে বীজ ছড়ালে চারাগাছগুলি যখন জন্মায় তখন দেখা যায় কোথাও সেগুলি খুব কাছাকাছি রয়েছে আবার কোথাও তারা রয়েছে দূরে দূরে। এই রকম অবস্থা হলে ফসল ভাল হয় না।

জমির চারিদিকে আল দিয়ে ঘেরা থাকে। এই রকম জমিতে বৃষ্টির জল জমা হয়ে থেকে জমিকে সরস করে এবং জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। আবার জমিতে বেশী জল যেন না দাঁড়াতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বেশী জল জমা হলে নালা কেটে জল বের করে দিতে হয় নচেৎ শিকড় পচে গিয়ে গাছ মারা যায়—ফসলের ক্ষতি হয়।

অনেক সময় দেখা যায় এক খণ্ড ছোট জমিতে বীজ ছড়িয়ে চারা-গাছ জন্মান হয়। এই চারাগাছগুলি তুলে এনে তৈরী জমিতে রোপণ করা হয়। বীজ ছড়াবার পর এবং চারাগাছ হলে জমির উপর বিশেষ নজর রাখতে হয় যাতে কীটপতঙ্গ, পাখি বা অন্য কিছু এদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। ফসলের জমিতে নানারকম আগাছা জন্মায়। সেগুলি সযত্নে ফেলে দিতে হয়।

ফসল পুষ্ট ও পরিপক্ব হওয়ার সময় কৃষিক্ষেত্রের উপর বেশী নজর দেওয়া হয়। ঠিক সময়ে ফসল কাটার বন্দোবস্ত করতে হয় এবং ফসল সংগ্রহ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফসল ঘরে তোলার পরেই কৃষিক্ষেত্রের যত্ন নেওয়া শেষ হয় না। ফসল কাটার পরেই একবার লাঙল দিয়ে কৃষিক্ষেত্রের আগাছা প্রভৃতি নষ্ট করে ফেলা হয়। ফসল কাটার পর উদ্ভিদের যে অংশগুলি জমিতে থেকে যায় সেগুলিও এই লাঙল দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলে নানারকম ফসলের চাষের পদ্ধতি জানা যায় এবং কৃষিকার্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

পল্লী অঞ্চলে অনেক পুষ্করিণী দেখতে পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় গ্রামবাসীরা কত বিভিন্ন কাজের জন্য পুষ্করিণী ব্যবহার করে। অনেক সময় পুষ্করিণীর জল জমিতে জলসেচের জন্য ব্যবহার হয়। এ ছাড়া ঐ জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গ্রামের লোকের স্নান, কাপড় কাচা প্রভৃতি কাজ, গো-মহিষাদির স্নান, এমন কি অনেক সময় অসুস্থ লোকের ময়লা জামাকাপড় ধোওয়া এই জলেই হয়। পুষ্করিণীর চারিপাশ উঁচু না হলে বৃষ্টিপাতের পর চারিদিকের মাঠ থেকে ময়লা ধোওয়া জল পুষ্করিণীতে এসে জমা হয়। এইরূপ নানাভাবে পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়ে যায়। এই জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর সহজেই তা বোঝা যায়। কতকগুলি জলবাহিত সংক্রামক ব্যাধি এইভাবে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে পুষ্করিণী পর্যবেক্ষণ করে জল যেন দূষিত না হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক গ্রামে আবার পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী সংরক্ষিত থাকে। এই সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জেনে অন্যত্র এই সব ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

পুষ্করিণী নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কচুরিপানা, ঝাঁজি শেওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে পুষ্করিণীর জল ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, পুষ্করিণী ক্রমে অগভীর হয়ে যায়। এইরূপ জল মশার বংশ বিস্তারের উপযুক্ত স্থান।

পুষ্করিণীর জলে নানারকম প্রাণী বাস করে। মাছ ছাড়া এখানে ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, জোঁক, মশার ডিম ও লার্ভা, শামুক প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণী পর্যবেক্ষণ করলে এইসব প্রাণীর জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে নানারকম জ্ঞান লাভ করা যায়।

বায়ু ও জল

বায়ু

ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বায়ুর স্তর পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। একেই বলে বায়ুমণ্ডল। আমরা সব সময় এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে রয়েছি। বায়ু ছাড়া কোন জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

বায়ু প্রবাহ ঃ বায়ু আমরা চোখে দেখতে পাই না তবে বায়ু যখন চলাচল করে তখন বলি হাওয়া বা বাতাস বইছে। গাছের পাতা নড়লেও বুঝতে পারি বায়ু চলাচল করছে। এইভাবেই আমরা বায়ুকে অনুভব করতে পারি। বায়ুর চলাচলকে বায়ু প্রবাহ বলে। সাধারণভাবে বায়ু প্রবাহকে হাওয়া বা বাতাস বলি। সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ গরম হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুও গরম হয়। বায়ু গরম হলে আয়তনে বেড়ে যায় ও হালকা হয়। এই হালকা বায়ু সহজে উপরের দিকে উঠে যায়। গরম বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকে। এর জন্যও বায়ু হালকা হয়ে উপরের দিকে ওঠে। যে স্থানের হালকা বায়ু উপরে উঠে যায় সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায় তখন বায়ুচাপের সমতা রক্ষার জন্য আশেপাশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু সেই স্থানে ছুটে আসে। এই বায়ুও কিছুক্ষণ পরে গরম হয়ে উপরে উঠে যায় এবং তার স্থানে নূতন ঠাণ্ডা বায়ু আসে। এইভাবেই বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

বায়ুর ধর্ম ঃ বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এর কোন রঙ নেই। বায়ুর কোন স্বকীয় আকার বা আয়তন নেই। কোন পাত্রে বায়ু রাখলে বায়ু সেই পাত্রের সব জায়গা জুড়ে পাত্রটিকে পূর্ণ করে রাখে। বায়ু গরমে প্রসারিত এবং ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। বায়ুর উপর চাপ কমে গেলে বায়ু প্রসারিত হয় এবং চাপ বেড়ে গেলে বায়ু সঙ্কুচিত হয়। বায়ুর ওজন আছে, সুতরাং বায়ুর চাপও আছে। বায়ুর সাহায্যে শব্দ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়।

বায়ুর উপাদান : অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন—এই দুইটি গ্যাস বায়ুর প্রধান উপাদান। আয়তন হিসাবে বায়ুর পাঁচভাগের মধ্যে প্রায় চারভাগ নাইট্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেন। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পও আছে তবে এ দুটির পরিমাণ খুব কম। এছাড়া বায়ুতে আরও কয়েকটি গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে থাকে। বায়ু এই সব উপাদানের একটি মিশ্রণ। মিশ্রণে উপাদানগুলির সাধারণ ধর্ম বদলায় না সেজন্য বায়ুতেও এই সব উপাদানের ধর্ম অবিকৃত থাকে, বায়ুর এই উপাদানগুলি সহজেই পৃথক্ করা যায়।

জীবের শ্বাসক্রিয়ায় এবং কাঠ কয়লা প্রভৃতি পোড়ানর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জন্মায়। বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেশী হলে বায়ু দূষিত হয়। এছাড়া পচা নালা, নর্দমা ও পায়খানার দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত গ্যাস এবং উনান ও কলকারখানার ধোঁয়া, ধুলা, পাট বা তুলার আঁশ প্রভৃতি জিনিস বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুকে দূষিত করে।

থুথু বা কফের সঙ্গে নানাপ্রকার রোগজীবাণুও বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুকে দূষিত করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু এইরূপে বায়ুর সঙ্গে সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়।

মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ও উপকারিতা : সকল জীবই শ্বাসপ্রক্রিয়ার সময় বায়ুর অক্সিজেন নেয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে বায়ুতে অক্সিজেন ত্যাগ করে। বদ্ধ বায়ুতে এইসব প্রক্রিয়া বেশীক্ষণ চলতে পারে না কারণ একই বায়ু বার বার ব্যবহার করার ফলে প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটে। এইসব প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখলে মুক্ত বায়ু ঘরে ঢুকতে পারে না। এইরকম ঘরে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বস্তি বোধ করতে হয় এবং শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হয়। বদ্ধ ঘরের ভিতর যে বায়ু থাকে তা শীঘ্রই দূষিত ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায় বলে এইরকম হয়। বায়ু চলাচল করলে মুক্ত বায়ু অবাধে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে, তখন আর এইসব অস্বস্তি বা কষ্ট অনুভব করতে হয় না। মুক্ত বায়ু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। মুক্ত বায়ু

দেহে সজীবতা আনে, মন প্রফুল্ল রাখে। মুক্ত বায়ুর অভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

দূষিত বায়ুর বিশোধনে উদ্ভিদের কার্য ঃ বায়ু প্রবাহের দ্বারা দূষিত বায়ু দূরে চলে যায়। বায়ুর ধুলা, বালি ও নানাপ্রকার রোগ-জীবাণু বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে পড়ে, ফলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। সূর্যের কিরণেও অনেক রোগের জীবাণু ধ্বংস হয়। কলকারখানা লোকবসতি থেকে দূরে স্থাপিত হলে বায়ু দূষিত হবার সম্ভাবনা কম। নর্দমা প্রভৃতি পাকা করে ঢেকে রাখার বন্দোবস্ত করা উচিত। পায়খানার মল যদি খোলা জায়গায় না থাকে তা হলে বায়ু দূষিত হবার সম্ভাবনা কম।

জীবদেহে শ্বাসক্রিয়ার ফলে বায়ুর অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাড়ে। এছাড়া কাঠকয়লা প্রভৃতি জ্বলে বলেও বায়ুর অক্সিজেন কমে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়। এই-রকম চলতে থাকলে বায়ু দূষিত হয়ে ব্যবহারযোগ্য থাকত না, আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই এই দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হয়। উদ্ভিদ দিনের বেলায় বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নেয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মাটি থেকে শোষণ করা জল দিয়ে উদ্ভিদ রৌদ্রের কিরণে সবুজকণার সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে এবং বায়ুতে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড কমছে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ছে। জীবের শ্বাস-ক্রিয়া এবং উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দুটি পাশাপাশি চলে বলে দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হয় এবং বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সব সময় প্রায় একই রকম থাকে।

জনসমাকীর্ণ ও রুদ্ধ গৃহের বায়ু ঃ থিয়েটার বা সিনেমা ঘরে অনেক লোক একত্রে সমবেত হয়। এইসব স্থানে সাধারণত ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকে। এইরূপ জনসমাকীর্ণ রুদ্ধ গৃহে অনেক লোকের শ্বাসক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, সেজন্য সেখানকার বায়ু খুব শীঘ্র দূষিত হয়ে পড়ে। এছাড়া লোকের জামাকাপড় ও দেহ থেকে নানারকম ময়লা ও দূষিত পদার্থ এই বায়ুতে

মিশে যেতে পারে। কোন লোকের দেহে যদি রোগজীবাণু থাকে তাহলে এই রোগজীবাণু বায়ুতে মিশেও বায়ু দূষিত করে। দরজা জানালা বন্ধ থাকায় এই দূষিত বায়ু রুদ্ধ গৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এইরূপ রুদ্ধ গৃহে কিছুক্ষণ থাকলেই নানা অস্বস্তি বোধ হয়। মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা বমি বমি করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক সময়



বৈদ্যুতিক পাখা দ্বারা দূষিত বায়ু বের করার ব্যবস্থা

অজ্ঞান হয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ জনসমাকীর্ণ রুদ্ধ গৃহে বেশীক্ষণ থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দর্শকদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য অধিকাংশ থিয়েটার বা সিনেমা ঘরে এই দূষিত বায়ু বের করে দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। এই দূষিত বায়ু বেরিয়ে গেলে অন্যপথে বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করতে পারে। এতে দর্শকদের শ্বাসকার্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলে, বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী ঃ জনবহুল স্থানে অথবা বাসগৃহে বায়ু চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার। শ্বাসকার্যের ফলে এখানকার বায়ুতে অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ে। এইরূপে বায়ু ক্রমে দূষিত হয়ে পড়ে। এছাড়া নিঃশ্বাসের বায়ু উষ্ণ এবং তাতে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে। মানুষের উষ্ণদেহের সংস্পর্শে এসেও বায়ু গরম হয়। এই দূষিত বায়ু গরম ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। সাধারণত ঘরের ছাদের কাছে ঘুলঘুলি বা 'ভেন্টিলেটর' থাকে। এই পথ দিয়ে দূষিত গরম বায়ু বেরিয়ে যায়, তখন জানালা দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা ও বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করে। এইভাবে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত করলে দূষিত বায়ু জমতে পারে না, আমাদের শ্বাসক্রিয়ারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

বাসগৃহে বায়ু চলাচল যাতে সহজ হয় সেজন্য দরজা জানালাগুলি বড় করা উচিত। জানালাগুলি পরস্পর বিপরীত দিকে অর্থাৎ রুজু রুজু থাকলে বায়ু ভালভাবে চলাচল করতে পারে। থিয়েটার ও সিনেমাঘরে দেওয়ালের উপরের দিকে বড় বড় ফোকরে বৈদ্যুতিক পাখা বসিয়ে ঘরের দূষিত বায়ু বের করে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রণালী ঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বাইরের বায়ু দেহের ভিতর টেনে নেওয়া হয় এবং পরে অতিরিক্ত বায়ু দেহ থেকে বের করে দেওয়া হয়। দেহের ভিতর বায়ু টেনে নেওয়াকে প্রশ্বাস গ্রহণ এবং দেহ থেকে বায়ু বের করে দেওয়াকে নিঃশ্বাস ত্যাগ বলে। প্রতিবার প্রশ্বাসের পর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয়। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকে একত্রে শ্বাসপ্রশ্বাস বলে। সাধারণত আমাদের মিনিটে ১৮ বার শ্বাসপ্রশ্বাস হয়। আমরা যখন কোন পরিশ্রমের কাজ করি তখন দেহ বেশী শক্তি জোগায়। এর জন্য দেহে দ্রুত দহন কার্য চলতে থাকে, ফলে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায় এবং বেশী কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এজন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। পরিশ্রমের সময় তাড়াতাড়ি শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে দেহে অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করা হয় এবং দেহের ভিতর উৎপন্ন দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়া হয়।

জল

ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগে রয়েছে জল। পুকুর, হ্রদ, খাল, বিল, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে জল থাকে তরল অবস্থায়। বাষ্প-রূপে জল বায়ুর সঙ্গে মিশে থাকে, আর জল কঠিন অবস্থায় পরিবর্তিত হলে বরফে পরিণত হয়।

জলের ধর্ম ঃ বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ তরল পদার্থ। জলের কোন রঙ নেই তবে জলরাশি বেশী গভীর হলে নীল আভা দেখা যায়। জল যখন যে পাত্রে রাখা যায় তখন সেই পাত্রের আকার পায়। তাপমাত্রা যখন শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কম থাকে তখন জল কঠিন অবস্থায় বরফরূপে থাকে। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ঊর্ধ্বের উষ্ণতায় বরফ গলে তরল অবস্থায় জলে পরিণত হয় আর এই উষ্ণতা যখন বেড়ে একশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পেঁৗছায় তখন জল ফুটতে আরম্ভ করে এবং বাষ্পে পরিণত হতে থাকে। চিনি, লবণ, তুঁতে প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সহজেই জলে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়।

জল সর্বদাই ঢালুর দিকে গড়িয়ে যায়। জলের উপরিভাগ সব সময় সমতল। বিভিন্ন আকারের কয়েকটি পাত্র তলার দিকে যদি নলদ্বারা পরস্পর জোড়া থাকে তাহলে এর যে কোন একটিতে জল ঢাললে সবগুলি পাত্রেই জলের উচ্চতা সমান হয়। একটি 'U' আকারের নলের একটি বাহুতে জল ঢাললে তার উভয় বাহুতেই জলের উচ্চতা সমান হয়। জলের এই ধর্মকে সমোচ্চশীলতা বলে।

জলের প্রয়োজনীয়তা ঃ জল ছাড়া প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না। উদ্ভিদ্ কোন কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদ্ মাটি থেকে তার খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান জলে দ্রব অবস্থায় শিকড়ের সাহায্যে শোষণ করে। জলে দ্রব না হলে উদ্ভিদের পক্ষে এইসব উপাদান শোষণ করা সম্ভব হয় না। জলে দ্রব অবস্থায় এই খাদ্যরস উদ্ভিদের দেহের মধ্য দিয়ে পাতায় যায়। সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পর তৈরী খাদ্য আবার দ্রব অবস্থায় উদ্ভিদের দেহের

বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। কাজেই জল না হলে উদ্ভিদ্ বেঁচে থাকতে পারে না।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধারণের জন্যও জল একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেহে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জল। খাদ্য হজম ও শোষণ করার জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। দেহের মধ্যে রক্ত তরল অবস্থায় প্রবাহিত হয়। জীর্ণ খাদ্য এই তরল রক্তে দ্রবীভূত অবস্থায় দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছায়। আবার বিভিন্ন স্থান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ তরল রক্তের সাহায্যে নিঃশ্বাস, বায়ু, ঘাম ও মূত্ররূপে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। রক্তকে তরল রাখতে এবং দেহ থেকে যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে তা পূরণ করতে জলের একান্ত প্রয়োজন। জল ছাড়া দেহের ভিতর কোন কাজই চলতে পারে না। দেহে জলের অভাব পূরণের জন্য জল পান করতে হয়, গরমে দেহ শীতল ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্নান করতে হয়। ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করতেও জলের প্রয়োজন। কৃষিকার্যে এবং রন্ধন ও অন্যান্য দৈনন্দিন কার্যে প্রচুর জলের প্রয়োজন। শুধু মানুষ এবং পশু নয়, কোন প্রাণীই জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।

জলের উপাদান ঃ আয়তনের দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল সৃষ্টি হয়। সুতরাং জল একটি যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থের ধর্ম উপাদানগুলির ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের নিজস্ব ধর্ম আছে কিন্তু জলের ধর্ম উপাদান দুইটির কোনটির মত নয়, সম্পূর্ণ আলাদা।

আমরা সাধারণত বৃষ্টির জল, নদীর জল, সমুদ্রের জল, এবং প্রস্রবণ-জল পাই। এর কোনটাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়।

বৃষ্টির জল ঃ বায়ুর মধ্য দিয়ে ভূপৃষ্ঠে পড়বার সময় এই জলে বায়ুর অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস কতকটা দ্রবীভূত হয়ে যায়। তা ছাড়া এতে বায়ুর ধূলিকণা মিশে যায়। বৃষ্টিপাত কিছুক্ষণ হওয়ার পর এতে ধূলিকণা আর থাকে না। তখন এই জলকেই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল বলা যেতে পারে।

নদীর জল ঃ বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠের উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে এসে

নদীতে পড়ে। এই জলে বালি, মাটি ও অন্যান্য অদ্রবণীয় পদার্থ ছাড়াও নানাবিধ দ্রবীভূত পদার্থ থাকে। অনেক সময় এই জলে রোগজীবাণুও থাকে। এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ভাল করে ফুটিয়ে, ছেঁকে নিয়ে তবে পান করা উচিত।

সমুদ্রের জল ঃ নদ-নদীর জল গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। ভূপৃষ্ঠ থেকে নানা রকম ময়লা ও দ্রবীভূত পদার্থও তাই সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া সমুদ্রের জল এত বেশী লবণাক্ত যে এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য।

প্রস্রবণ-জল ঃ বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। মাটিতে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় এই জল পরিস্রুত হয়। ভাসমান ময়লাগুলি দূর হয় কিন্তু এই জলে নানা প্রকার খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। অনেক সময় এই জলে রোগজীবাণুও থাকে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ছিদ্রপথে এই জল বেরিয়ে এসে প্রস্রবণ সৃষ্টি করে। অত্যধিক পরিমাণ খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে বলে এই জলের নানা রকম স্বাদ হয় এবং অনেক সময় এই জলের কোন বিশেষ রোগনিরাময় ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগজীবাণুমুক্ত হলে এই জল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

দূষিত জলদ্বারা সংক্রামিত ব্যাধি ঃ আমরা সচরাচর যে জল ব্যবহার করি নানাভাবে তা দূষিত হয়। বাসনমাজা, ময়লা কাপড় কাচা, স্নান করা, গরুমহিষাদি স্নান করান প্রভৃতি নানা উপায়ে জল দূষিত হয়। সাধারণত পুকুরের জলই এইভাবে দূষিত হয়। অনেক সময় মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মলমূত্রও এই জলে এসে মেশে। এর ফলে নানারকম রোগের জীবাণু এই জলে মিশে যেতে পারে। এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করলে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কুয়া যদি অগভীর হয় এবং বাঁধান না হয় তা হলে কুয়ার জলও দূষিত হতে পারে। কুয়ার নিকটবর্তী স্থান থেকে জল ময়লা ও রোগজীবাণু বহন করে মাটির স্তরের ভিতর দিয়ে গিয়ে কুয়ার জলের সঙ্গে মেশে এবং জলকে দূষিত করে। কুয়ার জল যদি ব্যবহার করা হয় তবে সেই জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ জলবাহিত। এইসব রোগের জীবাণু সাধারণত পানীয় জলের সঙ্গে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে। রোগীর মলমূত্র বা নোঙরা জামাকাপড় জলে ধোয়ার ফলে রোগজীবাণু জলে মিশে যায় এবং জল দূষিত হয়। এই জীবাণুদুষ্ট জল পান করেই সুস্থলোক রোগাক্রান্ত হয়। এইভাবে এই সব সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

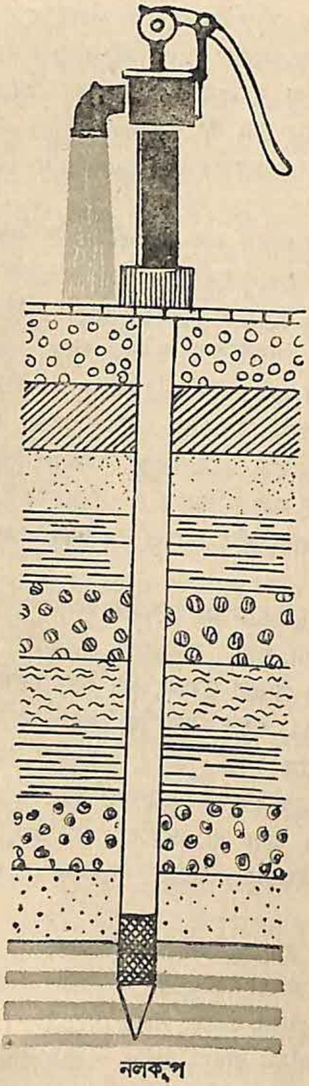
যে জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণ বেশী সেই জল অনেকদিন ধরে ব্যবহার করলে নানারকম অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জল বিশোধনের প্রণালী : গ্রামাঞ্চলে কূপ, পুষ্করিণী অথবা নদীর জলই পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়। নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণ ও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন এই জলে দ্রবীভূত থাকে বলে এই জল সুস্বাদু হয়। কিন্তু বালি, মাটি, শেওলা, গাছের পাতা বা অন্যান্য জিনিসের টুকরা, জীবজন্তুর মলমূত্র ও নানারকম রোগজীবাণু এই জলে মিশে একে দূষিত করে। এই জল পরিস্রুত ও রোগজীবাণু-মুক্ত করে পান করা উচিত, নচেৎ স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় ও নানারকম রোগ হতে পারে।

পুষ্করিণী ও নদীর জল কাপড়ে ছেঁকে নিলে ভাসমান পদার্থগুলি পৃথক্ হয়ে যায়। জল কিছুক্ষণ কোন পাত্রে স্থিরভাবে রেখে দিলে বালি, মাটি প্রভৃতি জিনিস ধীরে ধীরে পাত্রের তলায় জমা হয়। তখন উপরের জল আস্তে ঢেলে নেওয়া যায়। জলে ফটকিরি দিলেও বালি মাটি প্রভৃতি ময়লা তাড়াতাড়ি থিতিয়ে নিচে পড়ে। এইভাবে জল কিছুটা পরিস্রুত হলেও রোগজীবাণুমুক্ত হয় না। রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য জল ফুটিয়ে নিতে হয়। জল না ফুটিয়ে পানীয়রূপে ব্যবহার করলে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কূপ যদি গভীর এবং বাঁধন হয় তাহলে সেই কূপের জল সহজে দূষিত হয় না। কূপের মুখ ঢেকে রাখলে বাইরের ধূলাবালি অথবা অন্য ময়লা কূপের জলে পড়ে জল দূষিত করতে পারে না। কূপ বা পুষ্করিণীর জলে ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন অথবা পটাশ পারম্যাঙ্গানেট

মিশিয়ে জলের রোগজীবাণু ধ্বংস করা যায়। সংক্রামক রোগের বিস্তার বন্ধ করার জন্য এইরূপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে রোগজীবাণুমুক্ত ও নির্দোষ করার জন্য জল ভালভাবে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর পান করাই বাঞ্ছনীয়।



নলকূপ

নলকূপ ঃ জলের অভাব পূরণের জন্য এবং নির্দোষ পানীয়জল সরবরাহের জন্য আজকাল সর্বত্র নলকূপের প্রচলন হয়েছে। নলকূপে যে জল ওঠে তা মাটির অনেক নিচের স্তর থেকে আসে বলে এই জলে রোগজীবাণু থাকে না। মাটির অনেক নিচে যে স্তরে পান করার উপযুক্ত জল পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কতকগুলি নল পর পর জোড়া দিয়ে সেই স্তরে প্রবেশ করান হয়। সেইখানে নলের নিচের মুখে একটা ভাল ছাঁকনি লাগান থাকে। এই ছাঁকনিতে ছাঁকা হয়ে জল নলের ভিতর দিয়ে উপরে ওঠে। ভাল ছাঁকনি থাকার জন্য কোন ভাসমান ও অদ্রবীভূত পদার্থ জলের সঙ্গে আসে না। তাছাড়া নলের উপরের মুখটা সাধারণত একটা হাতপাম্প দিয়ে ঢাকা থাকে বলে বাইরের কোন ময়লাও নলের জলে মিশে জল দূষিত করতে পারে না। হাতপাম্প

চালিয়ে জল তোলা হয়। যেখানে বেশী জল তোলার প্রয়োজন সেখানে হাতপাম্পের বদলে বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প লাগান হয়। নলকূপের জলে সাধারণত নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ ও ধাতব লবণ দ্রবীভূত থাকে। পানীয় হিসাবে গভীর নলকূপের জল সবচেয়ে ভাল। এই জল না ফুটিয়েও নিশ্চিন্তে পান করা যায়।

শহরে যে জল সরবরাহ করা হয় তা নদী অথবা গভীর নলকূপের জল। নদীর জল সংগ্রহ করে প্রথমে পরিস্রুত করা হয়। এই পরিস্রুত জল ক্লোরিন মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করে সরবরাহ করা হয়।

নরম ও কঠিন জল ঃ জলের সঙ্গে সাবান ঘষলে ফেনা হয় কিন্তু নলকূপের জল অথবা সমুদ্রের জলে সহজে ফেনা হয় না। এই জলে অনেক সাবান খরচ করলে তবে ফেনা হয়। যে জলে অল্প সাবানে সহজে প্রচুর ফেনা হয় তাকে নরম জল বা 'মৃদুজল' এবং যে জলে সহজে ফেনা হয় না, প্রচুর সাবান খরচ করতে হয় তাকে কঠিন জল বা 'খরজল' বলে। খরজলে ক্যাল্সিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম ঘটিত লবণ দ্রবীভূত থাকে। জলের খরতা অস্থায়ী অথবা স্থায়ী হতে পারে। যে জলের খরতা অস্থায়ী তাকে অস্থায়ী খরজল এবং যে জলের খরতা স্থায়ী তাকে স্থায়ী খরজল বলে। ফুটিয়ে অথবা প্রয়োজন মত চুন বা সোডা মিশিয়ে জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়। স্থায়ী খরতা দূর করা সহজ নয়। কাপড়কাচা সোডা মিশিয়ে ছেঁকে নিলে অথবা সোডিয়াম পারমুটিট নামক রাসায়নিক পদার্থের ভিতর দিয়ে জলকে পরিচালনা করলে স্থায়ী খরতা দূর হয়।

খরজলে সাবান বেশী খরচ হয়। বেশী খরজল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। খরজলে অনেক খাদ্যদ্রব্য সহজে সিদ্ধ হয় না। কেটলি বা বয়লারে খরজল ব্যবহার করলে ভিতরে একটা শক্ত স্তর জমে যায়। এজন্য কেটলি বা বয়লার শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। শহরে সরবরাহের জন্য যে জল সংগ্রহ করা হয় প্রথমে পরিস্রুত করার পর সেই জলের খরতা দূর করে জলকে মৃদু করা হয়, তারপর জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়।

কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া একপ্রকার জ্বর। জ্বর আসার পূর্বে হাত পা ঠাণ্ডা হয়, তারপর প্রবল কাঁপুনির সঙ্গে জ্বর আসে। এই সঙ্গে তীব্র পিপাসা, মাথাধরার যন্ত্রণা ও বমি বমি ভাব থাকে। অনেক সময় বমি হয়। তিন চার ঘণ্টা পরে প্রচুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। ক্রমাগত ম্যালেরিয়া রোগে ভুগলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগীর শরীরে রক্তের লোহিতকণিকা সংখ্যায় কমে যায় এবং তার প্লীহা বড় হয়। ম্যালেরিয়া রোগে প্রত্যহ অথবা এক বা দুইদিন অন্তর একই সময়ে পালা দিয়ে জ্বর আসে।

এনোফিলিস জাতের স্ত্রীমশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। স্ত্রীমশা যখন কোন ম্যালেরিয়ার রোগীকে দংশন করে রক্তশোষণ করে তখন রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার দেহে যায়। মশার দেহে কয়েকদিন ধরে জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধি হয়। শুধু এনোফিলিস স্ত্রীমশার শরীরেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মশার দেহের ভিতর বিভিন্ন অবস্থায় কাটিয়ে জীবাণুগুলি শেষে মশার লালাগ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়। এই মশা পরে যখন কোন মানুষকে দংশন করে তখন মশার লালার সঙ্গে জীবাণুগুলি তার রক্তে প্রবেশ করে। মানুষের রক্তে জীবাণুগুলির দ্রুত বংশ-বৃদ্ধি হয়, এবং এজন্য পরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এইভাবেই সুস্থলোক রোগাক্রান্ত হয়।

মশার সাহায্যে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাতে হলে মশা ধ্বংস করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ মশা উড়ে বেড়ায়, এদের ধ্বংস করা কঠিন। এরা অন্ধকার ভালবাসে, তাই সন্ধ্যার সময় অন্ধকার হওয়ার পূর্বে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখলে ঘরে মশা কম হয়। ঘরে ধূপধুনা পোড়ালে অথবা ডি.ডি.টি. ও ফ্লিট প্রভৃতি

কীটনাশক ঔষধ ছড়ালে মশার উপদ্রব কমে যায়। বাচ্চা অবস্থায় মশা ধ্বংস করা সহজ। যেখানে মশা ডিম পাড়ে, সেখানে কেরোসিন তেল, ডি.ডি.টি. প্রভৃতি ছড়িয়ে দিলে মশার বাচ্চা শ্বাসকার্যের জন্য বাতাস নিতে পারে না বলে মারা যায়। মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাত্রে মশারির ভিতর শোয়া দরকার। নিয়মিত কুইনিন, প্যালুড্রিন প্রভৃতি ঔষধ সেবন করলে ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কলেরা

আমাদের দেশে গরমের সময় কলেরা রোগ দেখা দেয়। একপ্রকার জীবাণু থেকে এই রোগ হয়। কলেরা রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর ঘন ঘন পাতলা দাস্ত হয় ও সংগে সংগে বমি হয়। রোগী নির্জীব হয়ে পড়ে। পরে অসাড়ে চাল ধোয়া জলের মত দাস্ত হতে থাকে। রোগীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে, পায়ে খিল ধরে। রোগীর চোখ বসে যায়, তীব্র পিপাসা দেখা দেয় ও গলার স্বর ক্ষীণ ও বিকৃত হয়ে যায়। ক্রমে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেক সময় রোগীর জ্ঞান থাকে না।

রোগীর মলমূত্র, বমি প্রভৃতিতে রোগের জীবাণু থাকে। এই জীবাণু সাধারণত দুধ, জল প্রভৃতি পানীয়ের সংগে মানুষের পেটে যায়। মাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতি রোগীর মলমূত্র বা বমির উপর বসলে কলেরার জীবাণু এদের গায়ে লেগে যায়। এরা পরে যখন পানীয়ের সংস্পর্শে আসে তখন জীবাণু পানীয়ের সংগে মিশে যায়। এই জীবাণুদুষ্ট পানীয় গ্রহণ করার ফলে সুস্থলোকের দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। খাদ্যে জলীয় অংশ থাকে বলে খাদ্যও একইভাবে দূষিত হয় এবং এই জীবাণুদুষ্ট খাদ্য খাওয়ার ফলে রোগ হয়। এইভাবেই জলবাহিত জীবাণু দ্বারা কলেরা রোগ বিস্তার লাভ করে। রোগীর মলমূত্র, বমি, জামাকাপড় ইত্যাদি ফিনাইল, ডেটল প্রভৃতি জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা উচিত। যে পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করা হয় সেখানে রোগীর নোঙরা জামাকাপড় ইত্যাদি ধোয়া উচিত নয়, এতে

রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যখন কলেরা দেখা দেয় তখন জল ফুটিয়ে পান করা একান্ত প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্যে যাতে মাছি প্রভৃতি না বসতে পারে সেজন্য সব সময় ঢেকে রাখতে হয় এবং খাদ্য গরম থাকতেই খাওয়া উচিত। কলেরা রোগের ইঞ্জেক্‌শন নিলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

টাইফয়েড

আন্ত্রিকজ্বর বা টাইফয়েড রোগ টাইফয়েড জীবাণুর আক্রমণে হয়। এই জীবাণুগুলিও জলবাহিত। টাইফয়েড জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে মানুষের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে অন্ত্রে আশ্রয় নেয়। জীবাণুর আক্রমণে অন্ত্রে ক্ষত হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় জ্বর অবিরাম থাকে, এর সঙ্গে থাকে মাথার যন্ত্রণা ও পেটে অস্বস্তি এবং কখনও কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য। অন্ত্রে ক্ষত হওয়ার ফলে পরে দুর্গন্ধময় দাস্ত হতে পারে এবং অনেক সময় দাস্তের সঙ্গে রক্ত পড়ে। অবিরাম জ্বরের সঙ্গে দেখা দেয় বিকার ও অন্যান্য উপসর্গ। ক্রমে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

রোগীর মলমূত্র এমন কি থুথুতেও এই রোগের জীবাণু থাকে। মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়। এই রকম দূষিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার ফলেই এই রোগের আক্রমণ হয়।

এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে দুধ, জল প্রভৃতি ভাল করে ফুটিয়ে পান করা উচিত। মাছি প্রভৃতি যাতে খাদ্য দূষিত করতে না পারে সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সব সময় ঢেকে রাখা দরকার এবং খাদ্য গরম থাকতেই খেয়ে নেওয়া উচিত। টাইফয়েড রোগীকে স্বতন্ত্রভাবে রাখতে পারলে ভাল হয়। রোগীর মলমূত্র, থুথু, কফ জীবাণুনাশক ঔষধ মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করে গর্তে চাপা দিতে পারলেই ভাল হয়। রোগীর জামাকাপড়ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভালভাবে শোধন করে নেওয়া উচিত। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই রোগ বিস্তার লাভ করতে

পারে না। রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও অনেক সময় রোগীর মলে টাইফয়েড জীবাণু থাকে। এইজন্য আরও কিছুদিন রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্যা সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আজকাল টাইফয়েড রোগের টিকা (ইঞ্জেক্‌শন) প্রচলন হয়েছে। এই টিকা নিলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

বসন্ত

বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে বসন্তকালেই এই রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এই রোগে প্রথমে জ্বর হয়, সঙ্গে থাকে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা ও গায়ে ব্যথা। অনেক সময় রোগী জ্বরে অজ্ঞানের মত পড়ে থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যে রোগীর পিঠে, বুকে, কপালে, মুখে, ঘাড়ে, হাতে গুটি দেখা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা দেহে গুটি বের হয়। সাধারণত গুটি বের হওয়ার পর আর জ্বর থাকে না। বসন্ত রোগ দুরকমের—জল বসন্ত ও গুটি বসন্ত। জল বসন্তে গুটিগুলি জলভরা ফোস্কার মত দেখায়। জল বসন্ত তত মারাত্মক নয়। আর এক রকম বসন্তে গুটিগুলি ছোট ছোট ও লাল হয়। অনেক সময় এগুলি আবার দেহের ত্বকের নিচের দিকে বাড়ে। এই বসন্তই মারাত্মক, একে গুটি বসন্ত বলে। উভয় প্রকার বসন্তেই আট নয় দিন পরে গুটিগুলি পাকতে আরম্ভ করে এবং পুঁজে ভরতি হয়ে যায়। এজন্য সারাদেহে অত্যন্ত ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়। এই সময় আবার জ্বর হতে পারে। রোগের এই সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ক্রমে গুটিগুলি শুকিয়ে যায় ও গুটির উপরের মামড়িগুলি খসে পড়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। গুটি বসন্তে অনেক সময় ঘা হয়ে পুঁজ ও রক্ত পড়তে থাকে। ক্ষত হওয়ার জন্য সুস্থ হওয়ার পর রোগীর সমস্ত দেহে, বিশেষ করে মুখে, দাগ থেকে যায়।

বসন্ত রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ খুব ছোঁয়াচে। পরে গুটির পুঁজ, রক্ত, শুকনো মামড়ি, রোগীর থুথু, কফ প্রভৃতি থেকে এই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। শুকনো মামড়ি ওঠার সময় রোগ ছড়িয়ে পড়ার

সম্ভাবনা বেশী। সুস্থলোকের দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করলে রোগ, দেখা দেয়। নাক ও মুখের ভিতর যে নরম স্তর রয়েছে সেই পথেই এই জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। রোগীর জামাকাপড়ে এবং বিছানাতেও এই জীবাণু থাকে। এই রোগ বায়ু, মাছি প্রভৃতি দ্বারা বিস্তারলাভ করতে পারে। রোগীর দেহের ক্ষত ও পুঁজরক্তের সংস্পর্শে এলেও এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

বসন্ত রোগীকে আলাদা ঘরে সব সময় মশারির ভিতরে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এতে রোগ বিস্তার বন্ধ করা যায়। রোগীর সংস্রব এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। রোগীর জামাকাপড় ও বিছানা জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে শোধন করা উচিত এবং থুথু, কফ, মামড়ি, পুঁজরক্ত ইত্যাদিতে জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরে পুড়িয়ে ফেলতে পারলে ভাল হয়। রোগীর শুশ্রূষাকারীকে বিশেষ সাবধানে থাকতে হয়। রোগীর কাছে যাওয়ার সময় যে জামাকাপড় ব্যবহার করা হয় সেগুলি প্রত্যেকবার জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে শোধন করা উচিত। প্রত্যেক লোকের বসন্তের টিকা নেওয়া আবশ্যক। টিকা নিলে শরীরে এই রোগ-প্রতিরোধের শক্তি বাড়ে, এজন্য রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। শিশু জন্মাবার ছয়মাসের মধ্যেই টিকা দেওয়া উচিত। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি বৎসর শীতের সময় টিকা নেওয়া দরকার। টিকা নেওয়ার পরেও রোগের আক্রমণ হলে রোগ মারাত্মক হয় না।

যক্ষ্মা

ফুসফুসে যে ক্ষয়রোগ হয় তাকেই যক্ষ্মা বলে। ক্ষয়রোগ অন্ত্রে অথবা হাড়েও হতে পারে। এই রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে এই রোগ হয়। বায়ুবাহিত এই জীবাণু শ্বাসকার্যের সময় ফুসফুসে যায়।

এই রোগ অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। প্রথমাবস্থায় রোগী সব সময় ক্লান্তি বোধ করে এবং রোগীর ক্ষুধা কমে যায়। রোগীর শরীর ক্রমশ দুর্বল ও রোগা হয়ে পড়ে, তার ওজনও কমতে থাকে। পরে

প্রত্যহ বিকালের দিকে সামান্য জ্বর হয় এবং ভোররাত্রে প্রচুর ঘাম দিয়ে এই জ্বর ছেড়ে যায়। কাশি এবং বুকে ব্যথা হয়। রোগ মারাত্মক হলে কাশির সময় থুথু ও কফের সঙ্গে রক্ত পড়ে। রোগীর অবস্থাও দিনদিন খারাপ হতে থাকে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অত্যধিক পরিশ্রম, আলোবাতাসহীন গৃহে বসবাস প্রভৃতি কারণে শরীর দুর্বল হয়ে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই রোগের জীবাণু রোগীর থুথু কফের সঙ্গে বেরিয়ে আসে এবং বাতাসে মিশে যায়। সুস্থলোক এই দূষিত বাতাস শ্বাসকার্যে ব্যবহার করলে তার দেহে জীবাণু প্রবেশ করে। দেহ দুর্বল হলে এবং দেহের প্রতিরোধক্ষমতা কম হলে সুস্থলোকের দেহে এই রোগ প্রকাশ পায়। অনেক সময় মাছিদ্বারা এই রোগের জীবাণু খাদ্যে মিশে গিয়ে খাদ্য দূষিত করে। এই দূষিত খাদ্য খেলে রোগ হতে পারে। রোগগ্রস্ত গরুর দুধেও এই রোগের জীবাণু থাকতে পারে। এই দুধ থেকেও রোগ হতে পারে। রোগীর ব্যবহার করা বাসনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদে এবং বিছানায় এই রোগের জীবাণু থাকে। এগুলি অন্য কাহারও ব্যবহার করা উচিত নয়। যেখানে লোকের ভিড় হয় সেখানে না যাওয়াই ভাল, কারণ সেখানকার বাতাস জীবাণুদ্বারা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই রোগ সংক্রামক এবং কঠিন।

যক্ষ্মারোগীকে একেবারে পৃথক্ থাকার বন্দোবস্ত করা এবং রোগীর সংস্রবে কারও না আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুবিধা হলে রোগীকে হাসপাতালে অথবা স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠান ভাল। রোগীর মল, থুথু, কফ প্রভৃতি জীবাণুনাশক ঔষধ দেওয়া পাত্রে ফেলা উচিত। রোগীর জামাকাপড়, বাসনপত্র, বিছানা ইত্যাদিও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে নিয়মিত শোধন করা উচিত। অনেক সময় রোগী আপাতত সুস্থ হলেও তার দেহে এই জীবাণু থাকে এবং তার দেহ থেকে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই সব লোকের সংস্রব এড়িয়ে চলাই ভাল।

প্রচুর সূর্যকিরণ ও মুক্ত বায়ু সেবন করা, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, প্রয়োজনমত বিশ্রাম নেওয়া প্রভৃতি উপায়ে এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আজকাল বি.সি.জি. নামক টিকার (ইঞ্জেক্শন)

প্রচলন হয়েছে। অল্পবয়সে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এই টিকা দেওয়া হয়। এই টিকা নিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আজকাল এই রোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ বেরিয়েছে। সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা করলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা

মানুষের জীবনে যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানুষ অনেক সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, কি করবে ভেবে পায় না। এইরকম বিপদে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার আসার পূর্বে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেদেরই করতে হয়। এতে রোগী কিছু আরাম বোধ করে, বিপদের সম্ভাবনা কম হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়।

আগুনে পোড়া ঃ অনেক সময় অসাবধানতার জন্য কাপড়ে আগুন লাগে। এই অবস্থায় ছুটাছুটি করলে বাতাস পেয়ে আগুন আরও বাড়ে। লজ্জা না করে আগুন-লাগা জামাকাপড় খুলে ফেলতে হয়। কারও কাপড়ে আগুন লাগলে তাকে তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুইয়ে ফেলে কম্বল, চট অথবা তোশক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয়। এতে বাতাস না পেয়ে আগুন নিভে যায়। যার কাপড়ে আগুন লেগেছে সে যদি মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দেয় তা হলেও জামাকাপড়ের আগুন নিভে যায়। আগুন নেভাবার জন্য জল দিতে নেই। জল দিলে শরীরে ফোস্কা হয়ে যায়, পরে ঘা হয়।

আগুনে পোড়া অংশে বাতাস লাগলে জ্বালা করে। সামান্য পুড়লে ঐ জায়গায় নারিকেল তেল লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণা কমে। 'বারনল্' বা ঐ জাতীয় ঔষধ লাগিয়ে দিলেও খুব উপকার হয় ও আরাম লাগে। পোড়া জায়গায় ফোস্কা হলে, গেলে দেওয়া উচিত নয়। বেশী পুড়লে দেহের উষ্ণতার সমান উষ্ণ জলে সামান্য খাবার সোডা (এক সের জলে চায়ের চামচের তিন চার চামচ) মিশিয়ে পোড়া জায়গায় লাগালে ভাল হয়, যন্ত্রণাও কমে। এইরকম গরম জলে সের প্রতি এক বা দুই চামচ

ভরতি খাওয়ার লবণ মিশিয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। পোড়া জায়গায় জামা কাপড়ের কোন অংশ এ'টে থাকলে তা টেনে খুলতে নেই। চারধার থেকে কাঁচি দিয়ে যতটা সম্ভব কেটে নিতে হয়। সোডা মেশান জলে পোড়া অংশ ভিজিয়ে রাখলে যেটুকু কাপড় এ'টে থাকে তা সরান সহজ হয়। বেশী পুড়লে রোগীকে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রাখাই উচিত।

জলে ডোবা ঃ জলে ডুবে যাওয়াও একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা। বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকলে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। কেউ জলে ডুবেছে খবর পেলে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে জল থেকে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। জলে-ডোবা লোক ডাঙ্গায় তুললে অনেক সময় মনে হয় সে মারা গেছে। এই অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে জলমগ্ন লোকের দেহে শ্বাসকার্য আবার দেখা দিতে পারে—তার প্রাণরক্ষা সম্ভব হয়। জলে-ডোবা লোকের চিকিৎসার দায় ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিলেই ভাল। যতক্ষণ ডাক্তার না আসে ততক্ষণ তার প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেদের করতে হয়। ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলে রোগীর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

জলে-ডোবা লোককে জল থেকে তুলে ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে তার নাকের ও মুখের জলকাদা পরিষ্কার করে দিতে হবে। এইবার তাকে





কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালনা

উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। বুকের নিচে একটা বালিশ বা কাপড় জড় করে দিয়ে বুকের অংশ একটু উঁচু করতে পারলে ভাল হয়। দুই-পাটি দাঁতের মধ্যে একটা শক্ত কিছু দিয়ে হাঁ করিয়ে রাখতে হবে।

রোগীকে এই অবস্থায় শোয়াবার পর রোগীর এক পাশে রোগীর মাথার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে নিজের গোড়ালির উপর চেপে বসতে হবে। এইভাবে বসার পর রোগীর কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুইপাশে দুটো হাত দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরতে হবে যেন আঙ্গুলগুলো পাশাপাশি লাগা অবস্থায় থাকে এবং আঙ্গুলের আগাগুলো মাটির দিকে থাকে। হাতের কনুই সোজা থাকবে। শুশ্রূষাকারীকে এই অবস্থায় অর্থাৎ হাতের কনুই না বেঁকিয়ে হাঁটুগাড়া অবস্থায় গোড়ালি থেকে সরে সোজা হয়ে নিজের শরীরটাকে সোজা আপন হাতের উপর নিয়ে আসতে হবে। এতে তার দেহের ভার রোগীর কোমরের অংশে পড়বে। ফলে রোগীর দেহের ভিতরকার মধ্যচ্ছদার উপর চাপ পড়বে। এই চাপ ফুসফুস থেকে বায়ু বের করে দিতে সাহায্য করবে। সোজা হওয়ার পর শুশ্রূষাকারীকে আবার পূর্বাবস্থায় গোড়ালির উপর চাপ দিয়ে বসতে হবে। এতে রোগীর দেহের উপর চাপ কমে যাবে এবং তার মধ্যচ্ছদা নেমে যাবে। মধ্যচ্ছদা নেমে গিয়ে ফুসফুসে বায়ুগ্রহণ করতে সাহায্য করবে। চাপ দেওয়া এবং কমানোর এই প্রক্রিয়া মিনিটে ১২ বার হওয়া দরকার। এইরকম করলে রোগীর মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে। এই প্রক্রিয়া প্রায় একঘণ্টা চালানো উচিত। অনেক সময় তার পরেও রোগীর শ্বাসকার্য আবার আরম্ভ হয়। কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস একবার আরম্ভ হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়, তখন আবার এই প্রক্রিয়া চালানো প্রয়োজন। ডাক্তার এলে রোগীর চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

কুকুরে কামড় ঃ গৃহস্থের পোষা অথবা রাস্তার কুকুরে অকস্মাৎ কামড়ে দিতে পারে। যে কুকুর কামড়ায় সম্ভব হলে তাকে আট দশদিন বেঁধে রেখে দেখতে হবে কুকুরটি পাগল হয় কি না। কুকুর পাগল হলে তার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, চিৎকার করতে থাকে এবং সামনে যাকে পায় তাকেই কামড়ায়। তার মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে। ছাড়া থাকলে পাগলা কুকুর উত্তেজিত অবস্থায় দৌড়তে থাকে। এইরূপ অসুস্থ হওয়ার পর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কুকুরটি মারা যায়। পাগলা কুকুরের লালায় একরকম জীবাণু থাকে। কামড়ানোর সময় এই জীবাণু কুকুরের লালার

সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই জীবাণুর জন্য জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়।

কামড়ানোর পর সাধারণত দুইমাসের মধ্যেই এই রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগী অস্থির হয় এবং অতি সামান্য কারণেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। গলায় তীব্র বেদনাদায়ক পেশী সংকোচন হয় বলে জলপান করতে পারে না, জল দেখলেই ভয়ে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আরও নানা উপসর্গ দেখা দেয়, রোগী তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। এই রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং অনিবার্য মৃত্যুর কারণ।

কুকুরে কামড়ালে—তা সে পোষাই হোক আর রাস্তারই হোক,—ক্ষতস্থান অল্প চিরে রক্ত বের করে দিতে হবে এবং জীবাণুনাশক ঔষধ মিশ্রিত জলে ভাল করে ধুয়ে ঐখানে কার্বলিক অ্যাসিড অথবা নাইট্রিক অ্যাসিড লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ডাক্তারের পরামর্শমত চিকিৎসা করানো উচিত। যে কুকুর কামড়িয়েছে সেটি যদি পাগল হয়ে মারা যায় তাহলে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য অবিলম্বে 'ইঞ্জেক্‌শন' নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আজকাল অধিকাংশ বড় হাসপাতালে ও কলকাতার 'স্কুল অব্ ট্রপিকাল মেডিসিন'-এ এই 'ইঞ্জেক্‌শন' দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কুকুর পাগল না হলে সাধারণত ইঞ্জেক্‌শন নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। পাগলা শেয়ালে কামড়ালেও এই রোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে একইরকম প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং ডাক্তারের পরামর্শমত 'ইঞ্জেক্‌শন' নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

সর্পদংশন : আমাদের দেশে প্রায়ই সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। সব সাপের বিষ থাকে না। বিষধর সাপে কামড়ালেই তাড়াতাড়ি মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সাপে কামড়ায় সম্ভব হলে তাকে ধরে অথবা মেরে ফেলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় সাপটি বিষধর কি না। সচরাচর যে সব বিষধর সাপ আমরা দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে কেউটে ও গোখরো এবং চন্দ্রবোড়া। বিষধর সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে আধ থেকে এক ইঞ্চি ব্যবধানে দুটি সুচফোটানোর মত দাগ পাশাপাশি দেখা যায়। বিষধর সাপের মাথার উভয় পাশেই উপরের চোয়ালের একটু উপরে চোখের পিছনে একটি করে বিষের থলি

থাকে। উপরের চোয়ালে দুই পাশেই একটি করে বড় সুতীক্ষ্ণ বিষদাঁত থাকে। প্রত্যেক থলির সঙ্গে ঐদিকের বিষদাঁতের সংযোগ আছে। কামড়ানোর সময় সাপ বিষের থলি থেকে তরল বিষ দাঁতের ভিতর দিয়ে ক্ষতস্থানে ঢেলে দেয়। ক্ষতস্থানে সাধারণত এই একজোড়া বিষদাঁতের চিহ্নই দেখা যায়। সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে মিশলে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কেউটে, গোখরো জাতীয় সাপের দংশনে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়, কথা বলার শক্তি থাকে না, শরীর ক্রমশ অসাড় ও অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চন্দ্রবোড়া সাপের দংশনে ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে। ক্ষতস্থানে তীব্র বেদনা ও জ্বালা করে। চন্দ্রবোড়ার দংশনে রোগীর মাথাধরা, বমি প্রভৃতি দেখা দেয়, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে।


সাপের বিষদাঁত ও বিষের থলি

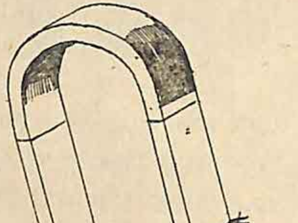
সাপে কামড়ালে দেরি না করে প্রথমেই ক্ষতস্থানের কিছু উপরে রবারের নল, দড়ি, রুমাল বা কাপড়ের পাড় দিয়ে একটি অথবা প্রয়োজন হলে পর পর দুইটি শক্ত বাঁধন দিতে হবে। এই উপায়ে ক্ষতস্থানের বিষ-দুষ্ট রক্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়া বন্ধ হয়। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে এই রকম বাঁধন দিতে পারলে ভাল হয়। পায়ে কামড়ালে উরুতে এবং হাতে কামড়ালে বাহুতে বাঁধন দিতে হবে। আধঘণ্টা পর পর বাঁধন আলগা করে এক মিনিটের জন্য রক্ত চলাচল করতে দেওয়া প্রয়োজন। রক্ত চলাচল একেবারে বন্ধ থাকলে সেই অংশে পচন আরম্ভ হতে পারে। বাঁধন দেওয়ার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারম্যাঙ্গানেট-মিশ্রিত জলে ভাল করে ধুয়ে দিতে হবে। এর পর ক্ষতস্থান ধারাল অস্ত্র দিয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি গভীর করে চিরে কিছু রক্ত বের করে দিতে হবে। এই রক্তের সঙ্গে খানিকটা বিষও বেরিয়ে যাবে। দেহের অন্য অংশে কামড়ালে বাঁধন দেওয়া যায় না এবং বাঁধন দিলেও কোন ফল হয় না।

সে ক্ষেত্রে বাঁধন না দিয়ে শুধু ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে হবে। রোগীকে চুপ করে শুইয়ে রাখা উচিত। যত শীঘ্র হয় ডাক্তার দেখিয়ে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ডাক্তারের উপদেশ ছাড়া বাঁধন একেবারে খুলে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসার জন্য কখনও ওঝার উপর নির্ভর করতে নেই। বিষধর সাপে না কামড়ালেও সর্পদংশন হয়েছে এই ভয়েই অনেক সময় রোগী মারা যায়। এজন্য রোগীকে ভরসা দিয়ে রোগীর মনে আশার সঞ্চার করতে হবে।

চুম্বক ও বিদ্যুৎ

চুম্বক ও বিদ্যুতের ব্যবহার

চুম্বক : যে পদার্থ লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি কয়েকটি ধাতব দ্রব্যকে আকর্ষণ করে তাকে চুম্বক বলে। একটি চুম্বক লৌহচূর্ণের নিকট নিয়ে গেলে চুম্বকটির উভয়প্রান্তে লৌহচূর্ণ লেগে যায়। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে বলেই এরূপ হয়। স্বভাবজাত চুম্বক পাওয়া যায় কম এবং তার শক্তিও ক্ষীণ। নানা প্রয়োজনে চুম্বক ব্যবহার হয় বলে কৃত্রিম উপায়ে শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করা হয়। চুম্বক যে সব ধাতব পদার্থকে আকর্ষণ করে সেইগুলি চুম্বকে পরিণত করা যায়। তবে লৌহ দিয়ে তৈরী চুম্বকই বেশী শক্তিশালী। স্থায়ী শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করতে হলে ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। নরম লোহার চুম্বক স্থায়ী হয় না।



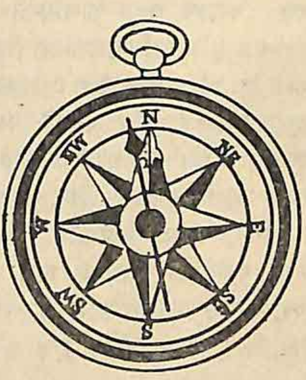
চুম্বকের গায়ে লৌহচূর্ণ

একটি চুম্বকের একই প্রান্ত দিয়ে একটি ইস্পাতদণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার ঘষলে দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। এছাড়া একটি নরম লৌহদণ্ডের গায়ে রেশম মোড়া বিদ্যুৎ-পরিবাহী তার জড়িয়ে সেই তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে লৌহটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। একে বিদ্যুৎ চুম্বক বলে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করলে লৌহদণ্ডটির চুম্বকত্ব থাকে না।

চুম্বকের মাঝখানে সুতা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি অবস্থায় স্থির হয়ে থাকে। এর একটা প্রান্ত সব সময় উত্তরমুখী হয়ে থাকে। চুম্বকটি নেড়ে দিলেও এই প্রান্তটাই আবার

উত্তরমুখী হয়ে স্থির হয়। এই প্রান্ত চিহ্নিত করে রাখলে সহজেই দিক্ নির্ণয় করা যায়।

চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির সাহায্যে কোন ধাতব পদার্থে লৌহ, নিকেল প্রভৃতি ধাতু আছে কিনা বোঝা যায়। এই সব ধাতুর টুকরা অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকলে চুম্বকের সাহায্যে সহজেই আলাদা করে নেওয়া যায়। চুম্বকের একটা প্রান্ত সব সময় উত্তরমুখী থাকে—এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বা কম্পাস তৈরী হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রায় দিক্‌নির্ণয় করতে পারে। শক্তিশালী বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে বৃহদাকারের ভারী ভারী লৌহপিণ্ড সহজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় যে ভার-উত্তোলনকারী যন্ত্র বা ক্রেন ব্যবহার হয় তাতে এইরূপ চুম্বক ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রেও বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়।



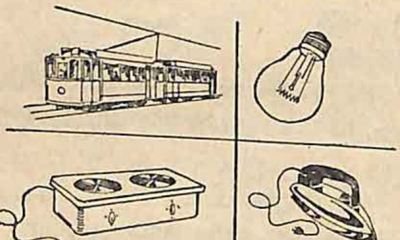
কম্পাস

বিদ্যুৎ ঃ তাপ ও আলোর মত বিদ্যুৎও একপ্রকার শক্তি। আমাদের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ-শক্তিকে আমরা বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছি। বিদ্যুৎ-শক্তিকে সহজেই তাপ, আলো, শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে লৌহকে চুম্বকে পরিণত করা যায়।

একটি কাচের দণ্ডকে রেশমের সঙ্গে ঘষলে অথবা একটি এবোনাইটের দণ্ডকে পশমের সঙ্গে ঘষলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেলুলয়েডের চিরুনি শুকনো চুলে ঘষলেও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ-শক্তিযুক্ত দণ্ডটি অথবা চিরুনিটি ছোট ছোট কাগজের টুকরোর কাছে নিয়ে গেলে টুকরোগুলিকে আকর্ষণ করে। এই বিদ্যুৎ উৎপত্তি-স্থলেই থাকে বলে একে স্থির-বিদ্যুৎ বলে। একটা কাচের পাত্রে

খানিকটা জলমিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে তাতে একটা তামার ও একটা দস্তার পাত আংশিক ডুবিয়ে পাত দুটির বাইরের অংশ তামার তার দিয়ে জুড়ে দিলে তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে। এইরূপ কোন ধাতব পদার্থের ভিতর দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে তাকে চল-বিদ্যুৎ বলে। কাচের পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দুটি ধাতব পাত আংশিক ডুবিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদনের যে বন্দোবস্ত তাকে 'বৈদ্যুতিক সেল' বা তড়িৎকোষ বলে। কতকগুলো বৈদ্যুতিক সেল একসঙ্গে জুড়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি বেশী করা যায়। এইরকম সেলের সমাবেশকে ব্যাটারি বলে। আজকাল নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং ডাইনামো নামক যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করা হয়।

বিদ্যুৎপ্রবাহ আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগান হয়। তারের ভিতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে তখন তার গরম হয়ে ওঠে। এইভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই বৈদ্যুতিক উনান, ইস্ত্রি প্রভৃতি তৈরী হয়েছে। তাপ যখন খুব বেশী হয় তখন বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-পরিবাহী তার আলো দিতে থাকে। বিদ্যুৎ-শক্তির এই ধর্ম কাজে লাগিয়ে আমরা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাই। বিদ্যুৎ-শক্তি নানা প্রকারে কাজে লাগিয়ে মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের সুখ ও সুবিধার জন্য, আরাম ও বিলাসের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমেই বেশী হচ্ছে। আলো, পাখা, উনান, ইস্ত্রি, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি বিদ্যুতের সাহায্যেই চালান হয়। ট্রাম ও রেলগাড়ি চালাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতারযন্ত্র, সিনেমা প্রভৃতি সবই বিদ্যুতের সাহায্যে চলছে। টর্চের যে আলো তাও বিদ্যুতের দান।



ট্রাম, ইলেকট্রিক বালব, ইলেকট্রিক উনান ও ইলেকট্রিক ইস্ত্রি

মানুষের কল্যাণের জন্য কত বিভিন্ন রকমে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে অধিকাংশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে এবং এইজন্য যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকমত চলে। সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্য, সুখ-সুবিধার জন্য চুম্বকের অবদানও অনেক। বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের সম্মিলিত ব্যবহারের ফলেই মানুষ পাখা, বৈদ্যুতিক মোটর, যানবাহন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি নানারকম যন্ত্রপাতি চালাতে পারছে, সুখ-সুবিধা ভোগ করছে এবং দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

সংগ্রহ-পুস্তক

কেমনভাবে ফুল সংগ্রহ করতে হয় ও কিভাবে সংগ্রহ-পুস্তক প্রস্তুত করতে হয় সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গাছপালা বা ফুলের নমুনা ছাড়া নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ এবং জীবজন্তুও সংগ্রহ করা যায়। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থার নমুনা সংগ্রহ করে রাখতে পার। প্রজাপতি, রেশম মথ, মশা প্রভৃতির বিভিন্ন অবস্থার নমুনাও সংগ্রহ করে রাখতে পার। প্রত্যেক সংগ্রহের সঙ্গে তার পূর্ণ বিবরণ, স্থান, সময় প্রভৃতি লিখে রাখতে হবে। সংগ্রহ-পুস্তকে এই লিখিত বিবরণ থেকে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবে। এইসব নমুনা তোমাদের সংগ্রহশালায় জমা করে রাখলে তোমাদের সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানচর্চায় নমুনা সংগ্রহ ও সংগ্রহ-পুস্তক প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন।

সমিতি সংগঠন

সমিতি সংগঠন ও প্রচারপত্র সম্পাদন

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি : পুস্তক পাঠ করে বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। এইসব বিষয় যদি তোমরা প্রত্যক্ষ কর এবং বিভিন্ন পরিবেশে গাছপালা, জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতালাভ করতে পার তবেই বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীরা বহু বৎসর ধরে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে নানারকম তথ্য জানতে পেরেছেন। কোন একজন লোকের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। এ জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এইজন্যই প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি বা কৃষক সমিতি গঠন করা আবশ্যক।

এইরকম সমিতি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তোমরা পূর্বেই জান। নিজেদের মধ্যে তোমরাও এইরকম একটা প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি গড়ে তুলবে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একটা দল একটা বিষয় পর্যবেক্ষণ করার ভার নেবে। প্রত্যেক দল যা পর্যবেক্ষণ করেছ তার যথাযথ বিবরণ সমিতির সভায় সকলকে জানাবে। সমিতির অধিবেশনে সভাপতি থাকবেন তোমাদের শিক্ষক মহাশয়। তোমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলি তিনি আলোচনা করে তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় তোমাদের প্রত্যেকের অনেক বিষয় জানা হবে। তোমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পদিনেই তোমরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে। তোমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে সমিতির সভায় উপস্থিত করলেই ভাল হয়। পরে এইগুলি একত্র করে হাতে লেখা পত্রিকা বের করতে পারবে এবং তোমাদের এইসব লেখা স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

যদি সম্ভব হয় সমিতির অধিবেশনে মাঝে মাঝে কোন বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ করে আনবে। তাঁর কাছ থেকে বিজ্ঞানের নানাবিষয়ে অনেক

নূতন তথ্য তোমরা জানতে পারবে। তাঁর কথায় এবং উপদেশে জ্ঞান-লাভ করবে, বিজ্ঞানচর্চায় তোমাদের আগ্রহ বাড়বে। নূতন নূতন বিষয় জানবার জন্য তোমাদের উৎসাহ দেখা দেবে এবং এই কাজে প্রচুর আনন্দ পাবে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতির একটি সংগ্রহশালা থাকলে ভাল হয়। কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, গাছপালা, ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করে এই সংগ্রহশালায় জমা রাখলে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের নিজস্ব উৎকৃষ্ট সংগ্রহশালা গড়ে উঠবে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে এইসব সংগৃহীত নমুনা সকলকে দেখাতে পারবে। এতে সাধারণ লোক অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হবে। জ্ঞান বিতরণের এই কাজে তোমরাও প্রচুর আনন্দ লাভ করবে।

কৃষক সমিতি ঃ কৃষিকার্যের জন্য কৃষক সমিতি গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষক লেখাপড়া জানে না কিন্তু কৃষিকার্যে তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। কৃষক সমিতিতে অভিজ্ঞ কৃষকদের সভ্য করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কৃষক সমিতির সভায় চাষ-আবাদ, সেচ-ব্যবস্থা, সার-প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনার বন্দোবস্ত করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে কৃষিকার্যের এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতিবিধান করাই হবে এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। তোমরা অনেকেই হয়ত ফল, ফুল ও সবজি চাষ করতে উদ্যোগী; এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কৃষকদের পরামর্শ নিলে তোমরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

কৃষি প্রচারপত্র ঃ কৃষক সমিতির উদ্যোগে কৃষি প্রচারপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রচারপত্র মারফত কৃষিকার্য সম্বন্ধে নানা তথ্য কৃষকদের জানাতে হবে। সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হয় ও বেতারে কৃষি সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয় সেগুলি সংক্ষেপে প্রচার-পত্রের মারফত কৃষকদের জানানো প্রয়োজন। আবহাওয়ার খবর, ফসলের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি, কীটপতঙ্গ দ্বারা ফসলের যে ক্ষতি হয় তা রোধ করার উপায় প্রভৃতি নানা বিষয়ের সংবাদ এই প্রচারপত্রে সম্পাদনা করে কৃষকদের জানাতে হবে। কোন্ সময় কোন্ ফসল বুনতে হবে বা

ফসলের যত্ন নেওয়ার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে এই প্রচার-পত্রের সাহায্যে কৃষকদের তা জানাতে হবে। যে সব কৃষক লেখাপড়া জানে না কৃষি সংক্রান্ত সংবাদগুলি তাদের পড়ে শোনাতে হবে। এইরূপে প্রচারপত্রের মাধ্যমে কৃষিকার্যের উন্নতিবিধান করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

উদ্ভিদের কথা

বৃক্ষের মূল ও পাতার কার্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
জবা অথবা অপরাজিতা ফুলের গঠন সম্বন্ধে যা জান লেখ।
ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথা

প্রজাপতির দেহের গঠন বর্ণনা কর।
প্রজাপতি ও গুটিপোকা কেমন করে চেনা যায়?
গুটিপোকা আমাদের কি উপকার করে?
মশার রূপান্তরের বিষয়ে যা জান লেখ। মশা আমাদের কি অপকার করে?
মৌমাছির জীবন-কথা বর্ণনা কর। মৌচাক থেকে কি কি জিনিস পাওয়া যায়?
পিপীলিকা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
ব্যাঙ কোথায় বাস করে? ব্যাঙের খাবার জিনিস কি এবং কিভাবে তা সংগ্রহ করে? শীতের সময় ব্যাঙ কি করে? ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে যা জান বর্ণনা কর।

মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান

মানবদেহের প্রধান অংশ কি কি? পেশীর কার্য কি? খাদ্যনালীর অংশগুলি বর্ণনা কর। রক্তের উপাদান ও কার্য কি? ফুসফুসের ভিতর রক্ত কিভাবে বিশুদ্ধ হয়? নার্ভের কার্য কি? ত্বকের সাহায্যে কি কি অনুভূতি হয়?

আকাশ পর্যবেক্ষণ

শিশির ও মেঘ কি প্রকারে হয়?
সূর্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
চন্দ্রের কলা কি? ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ক্যাসিওপিয়া কি এবং কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে হয় বুঝিয়ে দাও।

মাটি ও সার

মাটি কত রকমের? চাষের পক্ষে কোন্ মাটি ভাল? জমিতে সার দেওয়া দরকার কেন? কৃষিক্ষেত্র ও পুষ্করিণী পর্যবেক্ষণ করে কি লাভ হয়?

বায়ু ও জল

বায়ুর উপাদান কি কি? বায়ু কিভাবে দূষিত হয়? দূষিত বায়ু বিশোধনে উদ্ভিদের কাজ কি তা লেখ। মুক্ত বায়ুর উপকারিতা কি? বায়ু চলাচল প্রয়োজন কেন?

জলের ধর্ম ও উপাদান সম্বন্ধে যা জান লেখ। জলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। জল কিভাবে দূষিত হয়? দূষিত জল পান করা উচিত নয় কেন? নলকূপের জল ব্যবহার করা ভাল কেন? নরম ও কঠিন জলের পার্থক্য কি?

কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি

ম্যালেরিয়া কিভাবে বিস্তার লাভ করে? এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কি উপায়ে?

দুটি জলবাহিত রোগের নাম কর। কলেরা রোগের কারণ, বিস্তার লাভ ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে যা জান লেখ। বসন্ত অথবা যক্ষ্মা—যে কোন একটি ব্যাধি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা কর।

আগুনে পোড়ায় ও সর্পাঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে কি কি করা প্রয়োজন?

চুম্বক ও বিদ্যুৎ

চুম্বকের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

বিদ্যুৎ-শক্তি কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়—সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

সমিতি সংগঠন

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতির কার্যকারিতা ও পরিচালনা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

सत्यमेव जयते

No. 130977 /69-P.V.

8